ভেবে বলো তো।

ইলেকট্রিকের তার প্লাস্টিকের ভেতর ঢাকা থাকে কেন? আবার, বর্তনী তৈরির সময় ওই প্লাস্টিকের আবরণ ছাড়িয়ে নিতে হয় কেন?

ইলেকট্রিক সরঞ্জামে চিনেমাটি বা প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় কেন?

ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিরা যখন চালু লাইনে কাজ করেন তখন তাঁরা কাঠের আসবাবপত্রের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন কেন?

মনে রেখো, প্লাস্টিক, চিনেমাটি, কাঠ প্রভৃতি তড়িৎ-এর কুপরিবাহী।

## তড়িৎ প্রবাহের ফল

### হাতেকলমে 6

একটা চুম্বক শলাকা নাও। চুম্বক শলাকাকে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে সাম্য অবস্থায় আসতে দাও। এবার একটা শক্তিশালী ব্যাটারি, দু-টুকরো (একটা ছোটো ও একটা বড়ো) প্লাস্টিকের তার যাদের দু-প্রান্তে প্লাস্টিক ছাড়িয়ে ধাতব তারের কিছু অংশ বার করা আছে ও একটা সুইচ নাও। ছবির মতো করে বর্তনীটা তৈরি করো।

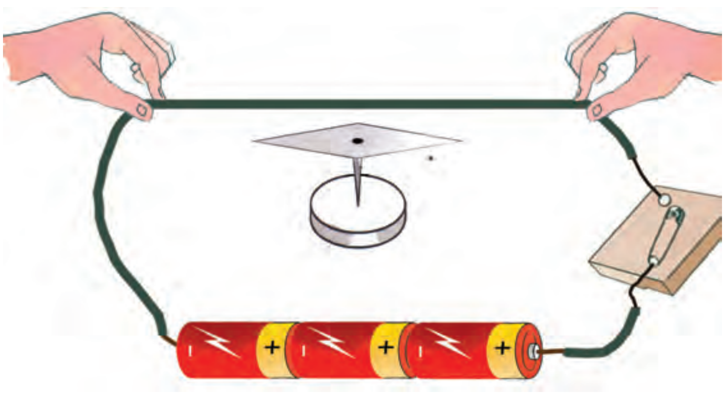

এবার, বড়ো তারটার দু-প্রান্ত হাত দিয়ে, চুম্বকশলাকার দুই সুচালো মুখ বরাবর চুম্বক শলাকার সামান্য একটু ওপরে টান টান করে ধরো। এবার বন্ধুকে বলো সুইচ অন করতে।

সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে, চুম্বকটার বিক্ষেপ হলো কেন?

কাছাকাছি তো কোনো চুম্বক নেই। তাহলে ওই চুম্বককে বল প্রয়োগ করল কে?

ভালো করে দেখো তো চুম্বকটা এখন কি আর উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে আছে?

এবার সুইচ অফ করে দাও।

কী দেখতে পেলে?

চুম্বকটার আবার বিক্ষেপ হলো। আর সাম্যাবস্থায় এসে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়াল।

তাহলে এই পরীক্ষা আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে চুম্বকের

ওপর তার প্রভাব পড়ে।

তোমরা দেখেছ, একটা চুম্বক শলাকার কাছে একটা দণ্ড চুম্বক নিয়ে এলে, শলাকাটির বিক্ষেপ হয়, কারণ শলাকাটির ওপর একটি চৌম্বক বল ক্রিয়া করে।

তাহলে ওপরের পরীক্ষায় চুম্বক শলাকার বিক্ষেপের জন্য যে চৌম্বক বল দায়ী তা এল কোথা থেকে? তড়িৎপ্রবাহের ফলে যে চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয় ওপরের পরীক্ষা তার প্রমাণ। কারণ সুইচ অফ করার পর ওই বলের আর অস্তিত্ব থাকে না।

**হাতেকলমে 7**

একটা সেল, একটা বড়ো লোহার পেরেক, কয়েকটা ছোটো পেরেক, তোমার তৈরি একটা সুইচ বোর্ড ও চারটে তার নাও। ছবির মতো করে সার্কিট তৈরি করো।

সুইচ 'অন' করো।

এবার বড়ো পেরেকটার কাছে ছোটো পেরেকগুলো ধরো।

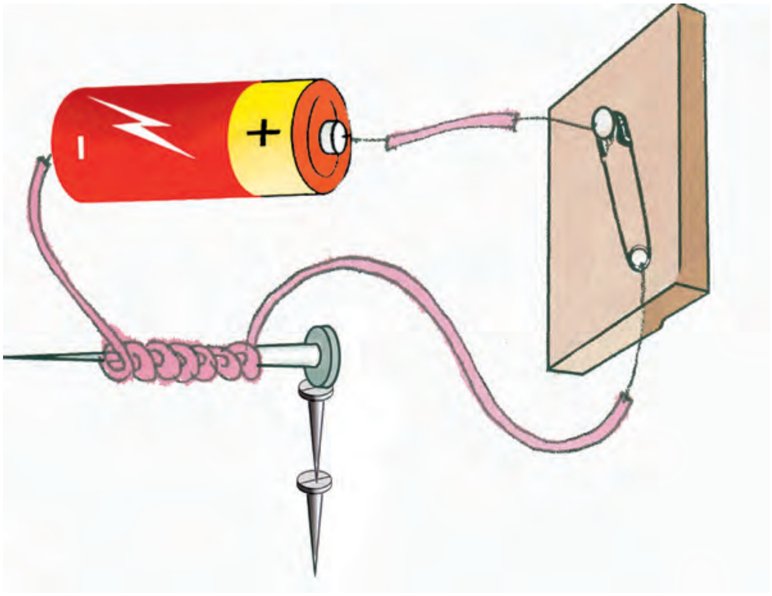


কী দেখলে বলো?

ছোটো পেরেকগুলোকে বড়ো পেরেকটা আকর্ষণ করছে কেন?

এবার সুইচ 'অফ' করো।

এবার বড়ো পেরেকটা কি আর ছোটো পেরেকগুলোকে আকর্ষণ করছে?

সুইচ 'অন' করলে বড়ো পেরেকটা ছোটো পেরেকগুলোকে আকর্ষণ করছে।

আবার অফ করলে তার আকর্ষণ ক্ষমতা চলে যাচ্ছে।

তবে কি তড়িৎ প্রবাহই ওই পেরেকটাকে চুম্বকে পরিণত করেছে?

কোনো চৌম্বক পদার্থের (লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি) ওপর তার জড়িয়ে ওই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পাঠালে ওই চৌম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়। এধরনের চুম্বককে **তড়িৎ চুম্বক** বলে। **তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে তা আর চুম্বক থাকে না।**

## হাতেকলমে 8

হাতেকলমে **7** -এর বর্তনীর (সার্কিটের) সুইচ 'অন' করো। দেখো সবচেয়ে বেশি কটা ছোটো পেরেককে বড়ো পেরেকটা আকর্ষণ করতে পারছে।

ছোটো পেরেকের সংখ্যা = ................টি।

এবার বড়ো পেরেকটার উপর তারের পাক সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। সুইচ অন করো।

এবার দেখো বড়ো পেরেক সবচেয়ে বেশি কটা ছোটো পেরেককে আকর্ষণ করতে পারছে?

ছোটো পেরেকের সংখ্যা = .................- টি।

প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের ছোটো পেরেকের সংখ্যা বাড়ল কেন?

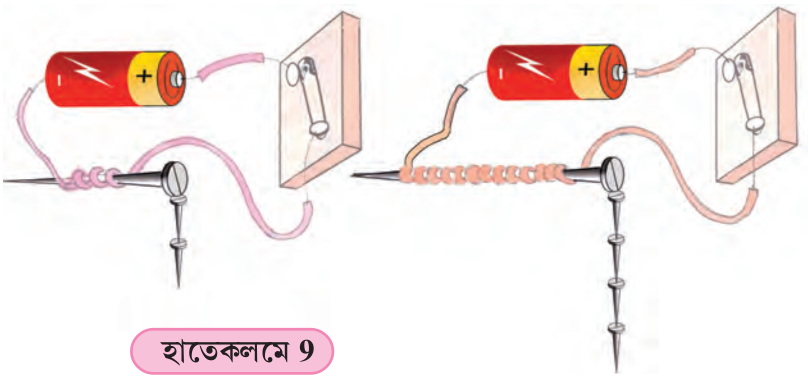

দ্বিতীয়বারে তড়িৎ চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়ল কেন?

**তারের পাক সংখ্যা বাড়লে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে।**

## হাতেকলমে 9

এবার তারের পাক সংখ্যা একই রেখে সেল সংখ্যা বাড়িয়ে পরীক্ষাটা করো। এবার দেখো আগের চেয়ে তড়িৎ চুম্বকটা (বড়ো পেরেক) আরও বেশি সংখ্যক ছোটো পেরেককে আকর্ষণ করছে কী?

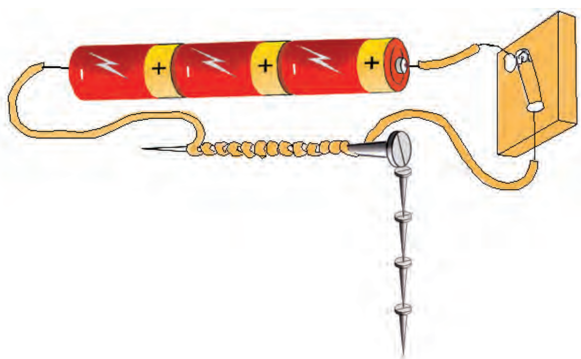

তাহলে দেখা গেল সেল সংখ্যা বাড়লে অর্থাৎ তড়িতের পরিমাণ বাড়লে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে।

### জেনে রাখা ভালো

**আজকাল তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার ক্রমে বেড়ে চলেছে। কয়েকটা উদাহরণ জেনে রাখো।**

- **ইলেকট্রিক কলিং বেলে** তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার হয়।
- **লাউড স্পিকার** তৈরি করতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

- **ইলেকট্রিক ক্রেনে** তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- চোখে কোনো চৌম্বক পদার্থের কণা পড়লে, তা তুলতে ব্যবহার হয় এক বিশেষ যন্ত্রের। সেই যন্ত্র তৈরিতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- **মোটর** তৈরিতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- **টেলিফোনে** তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

## তড়িৎ প্রবাহের ফলে আলো উৎপন্ন হয়

### হাতেকলমে 10

একটা **LED**(**L**ight **E**mitting **D**iode), একটা সেল, কয়েকটা দু-মুখ ছাড়ানো তার ও তোমার তৈরি একটা সুইচ নাও।

(**L**ight **E**mitting **D**iode)

**LED**

এমন এক ইলেকট্রনিক বস্তু যা সামান্য তড়িতেই আলো দেয়। এতে কোনো ফিলামেন্ট থাকে না। এর ধনাত্মক প্রান্তটা বড়ো আর ঋণাত্মক প্রান্তটা ছোটো। একটা LED কুড়ি বছরেও নষ্ট হয় না। বাজারে নানান রং-এর আলো নিঃসরণকারী LED কিনতে পাওয়া যায়।

নীচের ছবির মতো বর্তনী তৈরি করো।

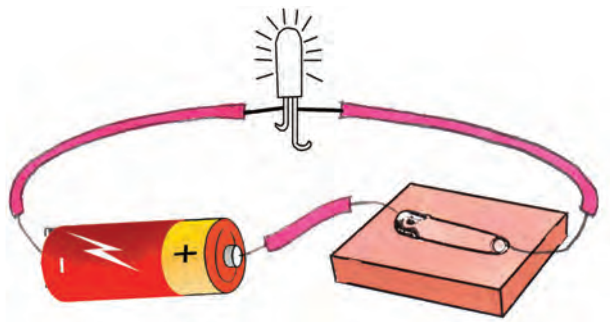

এবার সুইচটা অন করো।

কী দেখতে পেলে?

LED -তে উৎপন্ন এই আলোক শক্তির উৎস কী?

এবার সুইচটা অফ করো।

কী দেখলে?

LED - তে এবার আলো জ্বলল না কেন?

তাহলে দেখা যাচ্ছে LED -এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে, আলো জ্বলে। **তড়িৎ প্রবাহ না থাকলে আলো জ্বলে না।**

তাহলে কী তড়িৎ প্রবাহই LED -তে উৎপন্ন আলোর কারণ?

LED -এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হওয়ার সময় **তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।** তাই সুইচ অন করলে LED -এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ ঘটার ফলে LED জ্বলে ওঠে।

## হাতেকলমে 11

এখন 'হাতেকলমে-10' -এর বদলে দুটো সেল নিয়ে নীচের ছবির মতো করে সার্কিট তৈরি করো। সুইচ 'অন' করো।

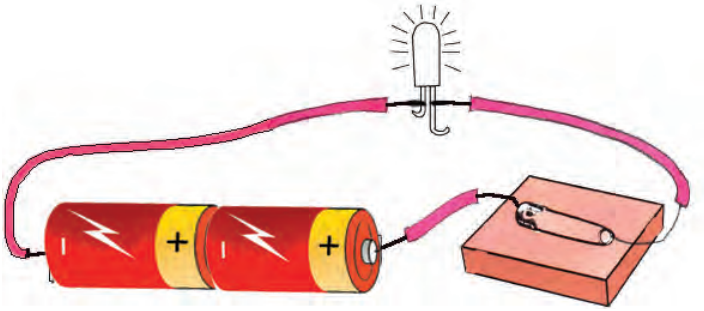

'হাতেকলমে-10' -এর চেয়ে এবার LED -এর আলো কি বেশি জোরালো? ভেবে বলো তো, হাতেকলমে-10-এর সার্কিটের সঙ্গে এবারের সার্কিটের পার্থক্য কোথায়? তাহলে কি সেলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আলোর জোর বেড়েছে? সেলের সংখ্যা বাড়লে সার্কিটে কিসের পরিমাণ বাড়ে?

তাহলে, LED -তে আলো জোরালো হওয়ার কারণ হলো ......................... ।[উপযুক্ত শব্দ বসাও]

**তড়িৎ প্রবাহ বাড়লে আলোর জোরও বাড়ে।**

## তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়

## হাতেকলমে 12

একটা নাইক্রোম তার (যে-কোনো ইলেকট্রিকের দোকানে পাওয়া যায়), দু-প্রান্ত ছাড়ানো কয়েকটা প্লাস্টিক তার, দুটো সেল, তোমার তৈরি একটা সুইচ, দুটো পেরেক ও একটা কাঠের ছোটো তক্তা নাও।

এবার ছবির মতো করে সার্কিট তৈরি করো। সুইচ 'অন' করার আগে নাইক্রোম তারটার উষ্ণতা হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করো। এবার, সুইচ 'অন' করো। এ অবস্থায় 10-11 সেকেন্ড রেখে দাও। আবার স্পর্শ করে দেখো।

দ্বিতীয়বারে নাইক্রোম তারের উষ্ণতা বেশি হলো কেন?

প্রথম ক্ষেত্রে নাইক্রোম তারের মধ্যে দিয়ে কি তড়িৎ চলাচল করেছিল?

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাইক্রোম তারের মধ্যে দিয়ে কি তড়িৎ চলাচল করেছিল?

তাহলে তড়িৎ চলাচলের জন্যই কি নাইক্রোম তারের উষ্ণতা বেড়ে গিয়েছিল?

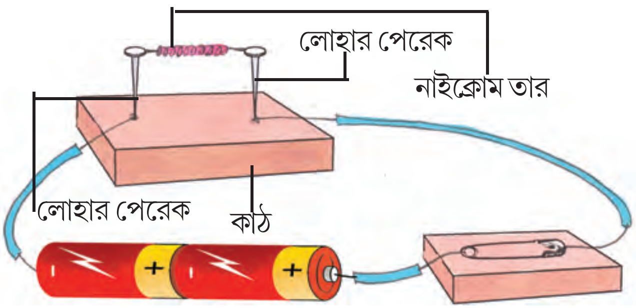


অতএব জানা গেল পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচল করলে পরিবাহীতে তাপ উৎপন্ন হয়।

আগের পরীক্ষাটিতে (হাতে কলমে 11) বাল্বটি কিছুক্ষণ জ্বলার পর তাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে দেখবে বাল্বটি গরম হয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও বাল্বের ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচল করার ফলেই এই তাপ উৎপন্ন হয়েছে।

## জেনে রাখা ভালো

**তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফলের কয়েকটা প্রয়োগ জেনে রাখো।**

1. **ইলেকট্রিক ইস্ত্রি:** এতে 'নাইক্রোম তার' অভ্রের উপর জড়ানো থাকে। ওর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলেই নাইক্রোম তার গরম হয়ে ওঠে।

2. **ইলেকট্রিক বালব:** বালবের ফিলামেন্ট তৈরি হয় **টাংস্টেন ধাতু** দিয়ে। ফিলামেন্টে তড়িৎ চলাচল হলেই তার মধ্যে উৎপন্ন হয় তাপ। এই তাপ শক্তি আলোক শক্তিতে বদলে গেলে উৎপন্ন হয় আলো।

3. **ফিউজ তার:** যে-কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটের নিরাপত্তার জন্য **ফিউজ তার** ব্যবহার হয়। এই ফিউজের মধ্যে দিয়েই তড়িৎ ওই সার্কিটে প্রবেশ করে। ফিউজ তার খুব কম উষ্ণতায় গলে যায়। ফলে কোনো কারণে খুব বেশি পরিমাণ তড়িৎ এসে পড়লে ফিউজ তার খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং গলে যায়। ফলে বর্তনী ছিন্ন হয়ে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাই সার্কিটের কোনো ক্ষতি হয় না। ফিউজ তার আবার পালটে দেওয়া যায়।

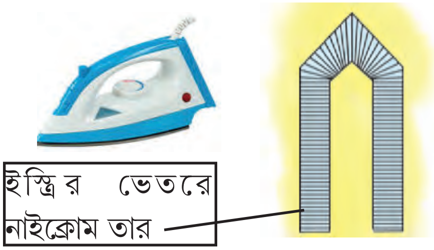


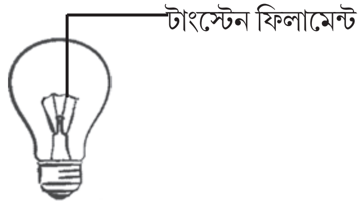

ফিউজ

**আলো থেকে তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন**

বলতে পারো ক্যালকুলেটার কোন শক্তিতে চলে? আর এই শক্তি ক্যালকুলেটার কোথা থেকে পায়?

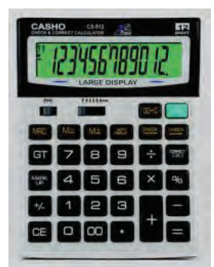


এবার ভেবে বলো, এমন ক্যালকুলেটারের কথা, যাকে চালু রাখতে 'সেল' বা 'ব্যাটারি' পালটাতে হয় না?

## সোলার ক্যালকুলেটার

সোলার ক্যালকুলেটার হলো এক বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র । এই যন্ত্রও চলে তড়িৎ শক্তি দিয়ে। ওই তড়িৎ শক্তির উৎস কিন্তু বাজারে যে সেল বা ব্যাটারি পাওয়া যায় সেটা নয়।

তাহলে ওই তড়িৎ আসে কোথা থেকে?

আসলে, সোলার ক্যালকুলেটারের তড়িৎ জোগান দেয় সোলার প্যানেল। কতগুলো সোলার সেল দিয়ে এই প্যানেল তৈরি হয়। সূর্যের আলো ওই প্যানেলের উপর পড়লে ওই আলোক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে বদলে যায়।

সৌর শক্তিতে চলে এমন আর কোনো উদাহরণ কি তোমার জানা আছে?

সোলার কুকার, সোলার টেবিল ফ্যান, সোলার টিউবলাইট, সোলার স্ট্রিট লাইট ইত্যাদি সবই চলে সৌর শক্তিতে।

সোলার প্যানেলের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম। তবুও এখনও যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি সেখানে সৌরশক্তিচালিত যন্ত্রই একমাত্র ভরসা।

## জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় তড়িৎ শক্তির প্রভাব

তড়িৎ শক্তির ও জীবজগতের সম্পর্কও বেশ গভীর। তোমরা জানো যে ইলেকট্রিকের খোলা তারে হাত দিলে আমাদের দেহের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলে যায়। আমরা বলি 'শক' লেগেছে। সমস্ত জীবের দেহের তরলে তড়িৎযুক্ত নানান ধরনের পরমাণু আর পরমাণু জোট থাকে। এইসব তড়িৎযুক্ত কণার উপস্থিতির জন্য জীবদেহের তরল তড়িৎ পরিবাহী হয়।

জেলিফিশ, ইলেকট্রিক ইল (eel) মাছের কথা কী তোমরা শুনেছ? এদের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা আছে। এরা যথেষ্ট তীব্র তড়িৎ তৈরি করতে পারে। এই বিদ্যুৎ শত্রুকে হতভম্ব করে দেয় আর দূরে সরিয়ে রাখে।

হৃৎপিণ্ডের পেশিতে তড়িৎ উদ্দীপনা তৈরির জন্য এক বিশেষ ধরনের উপাদান থাকে। এদের তৈরি তড়িৎ উদ্দীপনা হৃৎস্পন্দন তৈরি করে। যা সারা দেহের বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

জেলি ফিশ

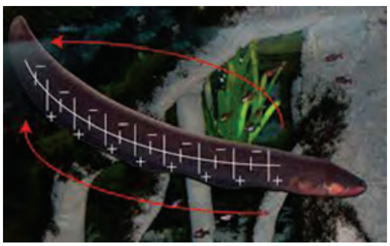

ইল

মস্তিষ্ক তরঙ্গও তড়িতীয়। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোশ নিয়ে গঠিত। স্নায়ুকোশের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য তড়িৎ উদ্দীপনার সাহায্যেই পরিবাহিত হয়। ফলে পেশির সংকোচন-প্রসারণ সম্ভব হয়। আমরা চলাফেরা ও নানা কাজ করতে পারি। জীবেরা উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

1930-এর দশকে একদল বিজ্ঞানী স্কুইড বলে একরকম অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুকোশ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা বুঝলেন যে স্নায়ুকোশের ভিতরে ও বাইরে তড়িৎবাহী কণাদের সংখ্যা ও প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। তড়িৎবাহী কণার পরিমাণে এই পার্থক্য থাকার জন্যই স্নায়ুকোশ বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। এত প্রাণী থাকতে স্কুইড কেন?- মানুষের স্নায়ুকোশ খুব সরু তাই তা নিয়ে পরীক্ষা করা শক্ত। স্কুইডের স্নায়ুকোশের ব্যাস মানুষের স্নায়ুকোশের ব্যাসের প্রায় 25 গুণ। তাই তা নিয়ে পরীক্ষা করা সহজ।

স্কুইড

## পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার

বিভিন্ন ধরনের শক্তি, তাদের উৎস ও রোজকার জীবনে তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে তোমাদের একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা এতক্ষণে হয়ে গেছে।

আমাদের জীবনধারণ অনেকটাই বহু প্রচলিত কয়েকটি শক্তি-নির্ভর।

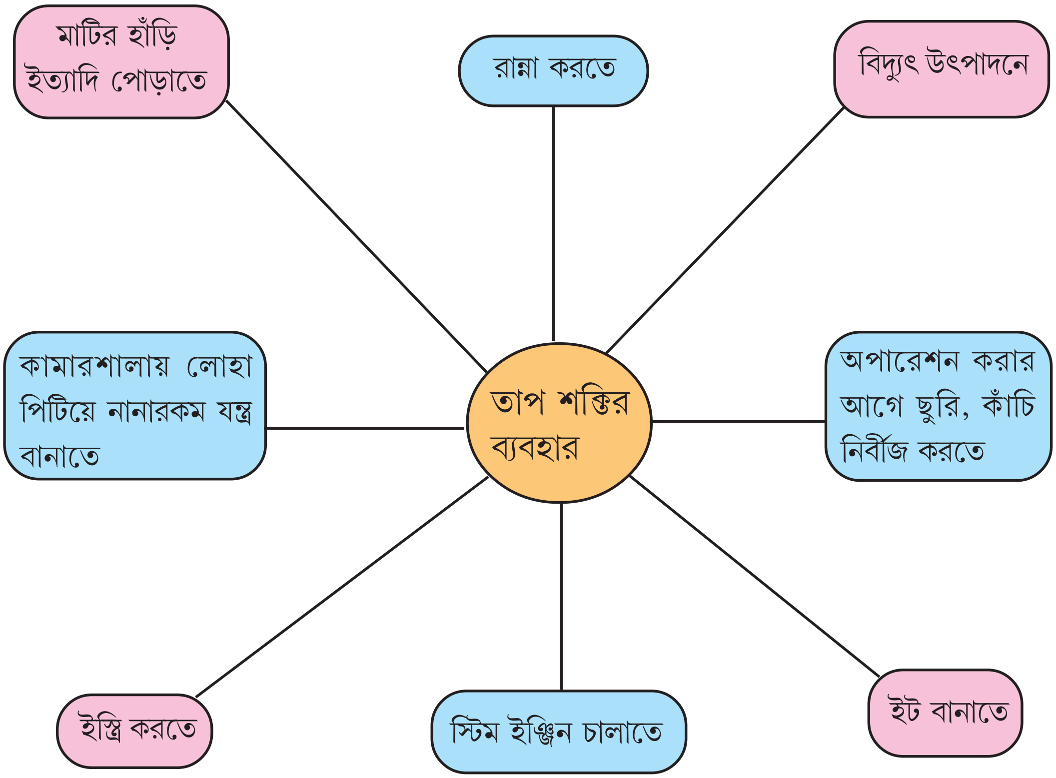


তুমি তাপশক্তির আরো কয়েকটি ব্যবহার নীচের ফাঁকা ঘরে লেখো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

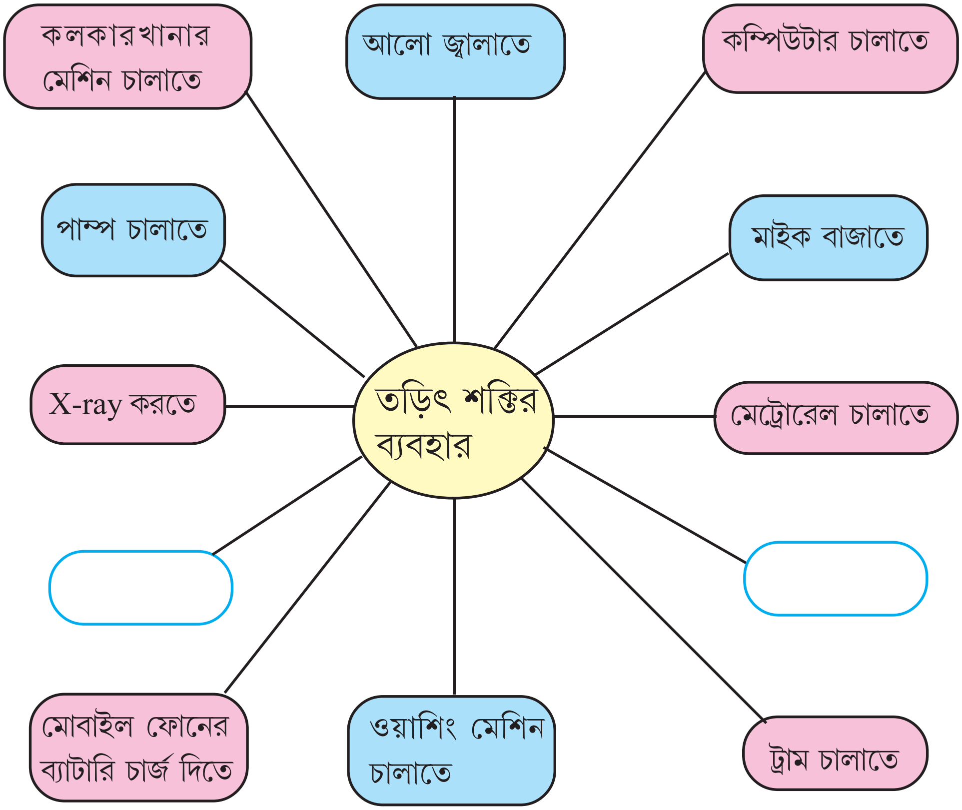


তড়িৎ শক্তির অন্য কোনো ব্যবহার তোমার জানা থাকলে ওপরের ফাঁকা জায়গায় তা লেখো। নীচে আমাদের পরিচিত জীবাশ্ম জ্বালানির অন্য কোনো ব্যবহার জানা থাকলে ফাঁকা জায়গায় তা লেখো।

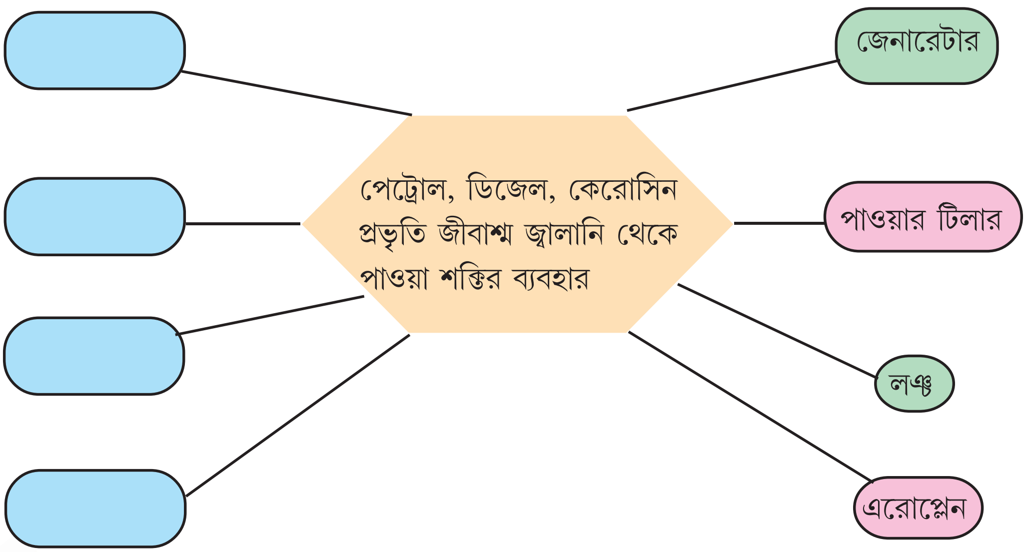

এভাবেই আরো অনেক উদাহরণ তোমরা নিজেরাই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারবে। এই ধরনের প্রচলিত শক্তির চাহিদা কি বছরের পর বছর একইরকম থাকছে?

মোটেই না। উপরন্তু দিনদিন তার চাহিদা বেড়েই চলেছে। তার একটা কারণ হলো জনস্ফীতি, আর অন্যান্য কারণ হলো নগরায়ন এবং যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতা।

জনসংখ্যার সঙ্গে কোন কোন বিষয় সরাসরি যুক্ত?

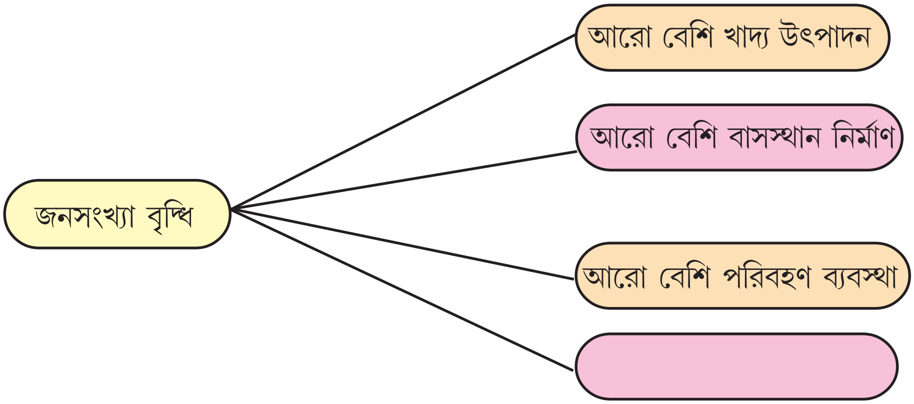


এই প্রতিটি চাহিদা পূরণের জন্যেই চাই শক্তি। আর শক্তির প্রধান প্রাকৃতিক উৎস হিসাবে আমরা কী বেছে নিয়েছি?

মাটির তলায় থাকা জ্বালানির ভাণ্ডারকে; যেগুলো সবই জীবাশ্ম জ্বালানি। এই জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়েই তৈরি করে নিয়েছি বিদ্যুৎ। আমাদের রাজ্যে বা দেশের মধ্যেও মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিংহভাগই কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপবিদ্যুৎ।

**ভেবে দেখো** 100-150 বছর আগে লোকসংখ্যাই বা কত ছিল? তাহলে পরিবহণ, বিদ্যুতের ব্যবহার, যন্ত্রের ব্যবহার কত কম ছিল! আর এখন?

পুরোনো দিনের গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা

বর্তমানে শহরের মানুষের জীবনযাত্রা

কিন্তু মাটির তলার এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ (জীবাশ্ম জ্বালানি), তার জোগান কি অফুরান?

কখনই নয়। এই কয়লা বা জ্বালানি তেল তৈরি হতে কত কোটি বছর সময় লেগেছে বলো তো?

যতদিন সময় লেগেছে এই সম্পদ তৈরি হতে, তার অনেক কম সময়েই মানুষ খরচ করে ফেলেছে তার অধিকাংশ। এইভাবে একদিন শেষ হয়ে যাবে মাটির তলার কয়লা বা খনিজ তেলের ভাণ্ডার।

কয়লা তৈরির বিভিন্ন ধাপ

**জানো কি,** মাটিতে ড্রিল করে প্রথম পেট্রোলিয়াম উৎপাদন শুরু হয় আমেরিকা মহাদেশে, 1859 সালে।

এই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার যত বেড়েছে, পরিবেশে বেড়েছে তার দহনে উৎপন্ন পদার্থগুলোর বহুমুখী ক্ষতিকারক প্রভাবও। এই ধরনের জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারে পরিবেশে যে যে ক্ষতিগুলো হতে পারে, তার কয়েকটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

তাহলে এর থেকে বাঁচতে গেলে আমরা কী করব? এখন যেসব প্রচলিত শক্তির ব্যবহার করছি, তার ব্যবহার কি বন্ধ করে দেবো? তখন আমাদের নীচের কাজগুলো চলবে কীভাবে?

বাড়িতে আলো জ্বালাতে হবে, পাখা, টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদি চালাতে হবে।

জ্বালানি-নির্ভর পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

যন্ত্রচালিত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে যেখানে বিভিন্ন শক্তি লাগে। তবে কি কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে? তাহলে এখনকার শিল্পগুলোর কী হবে?

সেজন্য আমাদের অন্য শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হবে, যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি করবে আমাদের। এগুলোই হলো পরিবেশবান্ধব শক্তি।

কী কী হতে পারে এই ধরনের শক্তির উৎস? এসো দেখা যাক।

## সৌরশক্তি

আমরা প্রচলিত শক্তির উৎস হিসাবে যে জীবাশ্ম জ্বালানি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছি; তা আসলে উৎপন্ন হয়েছে কী থেকে?

তোমরা তো জানো সবুজ উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। এই কাজে তারা কোন প্রাকৃতিক শক্তি কাজে লাগায়? — সৌরশক্তি।

প্রাণীরাও বেশিরভাগই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপরেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রাণীরাও পরোক্ষভাবে কোন প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল? সৌরশক্তি।

এর থেকে কী বোঝা যাচ্ছে?

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে কোন শক্তি পরিবর্তিত হয়ে আবদ্ধ থাকছে? সৌরশক্তি।

উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ কোটি কোটি বছর মাটির তলার তাপ ও চাপে থাকতে থাকতে পরিবর্তিত হয়ে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন করে।

তাহলে কয়লা বা জ্বালানি তেলে কোন শক্তি পরিবর্তিত হয়ে আবদ্ধ আছে? সৌরশক্তি।

আমরা পরোক্ষভাবে এই সৌরশক্তির উপর এভাবে নির্ভর না করে কি সরাসরি সৌরশক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না?

এই চিন্তা থেকেই ব্যবহার শুরু হয়েছে সৌরকোশের। দিনের বেলায় যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে অবিরাম এসে পৌঁছোয়, তাকে কাজে লাগিয়েই এই সৌরকোশে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তারপর সৌরপ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা যায়। রাতের বেলা বা কম সূর্যের আলোতেও তা ব্যবহার করা যায়।

নীচের ছবিগুলো লক্ষ করো। দেখো কত নানারকম ক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার করা হয়।

সোলার লাইট

সোলার ক্যাপ

সোলার কুকার

সোলার বাইক

সোলার ওয়াটার হিটার

সোলার সিগন্যাল

সোলার মোবাইল চার্জার

বিদেশে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার হয়ে আসছে সৌরশক্তির। এখন আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে তার ব্যবহার। তুমি কোথাও এরকম ব্যবহার দেখেছ কি? জানলে নীচে তা উল্লেখ করো:

কোন জায়গায় সৌরশক্তির ব্যবহার হচ্ছে? ..................................................................।

কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে? ..............................................................।

আশা করা যায়, আগামী দিনে সৌরশক্তির আরও ব্যাপক ব্যবহার আমরা দেখতে পাব।

কিন্তু সৌরপ্যানেল থেকে আবার পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না তো?

অতটা হবে না, কারণ এমনিতেই এইসব প্যানেল 10-15 বছর ঠিক থাকে। তাছাড়াও এই প্যানেলের পুনর্নবীকরণ করে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। তবে সৌরকোশ তৈরি করতে শুরুতে কিছুটা প্রচলিত শক্তি ব্যয় করতে হয়।

## বায়ুশক্তি

আমাদের পরিচিত আরো একটা পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস প্রায় অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। তাহল বায়ু প্রবাহের শক্তি।

বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বড়ো মাপের বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা সম্ভব। আমাদের রাজ্যের বকখালিতে গেলে দেখতে পাবে— বড়ো বড়ো বায়ুকল (Wind mill) কীভাবে এইকাজে সাহায্য করছে।

বায়ুপ্রবাহের শক্তি ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা হতে পারে আমাদের?

1. বায়ুর কোনো অভাব নেই।
2. একবার বায়ুকল বসালে দীর্ঘদিন চলবে।
3. যেসমস্ত জায়গায় দূর থেকে তার সংযোগ করে বিদ্যুৎ আনা সম্ভব নয়, সেখানে বায়ুশক্তির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

আমাদের রাজ্যের অন্য কোনো জায়গায় অথবা ভিনরাজ্যের কোনো জায়গায় বায়ুকল দেখে থাকলে জায়গাটার নাম লেখো : ...........................................................................।

জানার চেষ্টা করো বায়ু শক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোন কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

## জৈবশক্তি

অন্য একটা অপ্রচলিত কিন্তু পরিবেশবান্ধব শক্তি-উৎস কী হতে পারে?

জৈব বর্জ্য বা জৈব উৎসজাত (উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ) পাওয়া জিনিস থেকে উৎপন্ন জৈব গ্যাস।

ধরো, তোমার এলাকায় কারোর ছোটো বা বড়ো মাপের পশুখামার আছে। অথবা কারোর মুরগির পোলট্রি আছে। তাহলে তাদের মল ফেলা হলে তা পরিবেশে একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। কীভাবে তা কাজে লাগানো যায়?

এই সমস্ত গৃহপালিত পশু-পাখির মল বড়ো গর্তে পচিয়ে তার থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হবে, তা কাজে লাগানো যেতে পারে। কী কী কাজে?

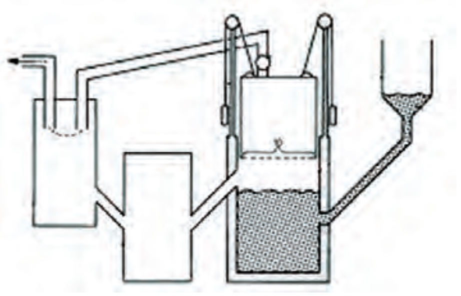

জৈব বর্জ্য থেকে জ্বালানি গ্যাস উৎপন্ন করার ব্যবস্থা

একটু ভেবে, লেখার চেষ্টা করো (প্রয়োজনে শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নাও):

1. ....................................।
2. ....................................।

এভাবেই পৌরসভার পচনযোগ্য জৈব বর্জ্য বা কচুরিপানার মতো আগাছা কাজে লাগানো যাবে কিনা, তা আলোচনা করো। এগুলো কীভাবে কাজে লাগানো যাবে।........................................।

এই কয়েকটি পরিবেশবান্ধব শক্তি ছাড়াও আরো কয়েকটা অপ্রচলিত শক্তির বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন

বিজ্ঞানীরা। সেগুলো কী কী?

জোয়ারভাটার শক্তি, মাটির নীচের তাপশক্তি ইত্যাদি।

এরপরও সত্যিকারের পরিবেশবান্ধব হতে গেলে আমাদের আরো একটু সতর্ক হতে হবে। কী কী বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে?

যথাসম্ভব শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এখনকার মতোই যদি কয়লা বা খনিজ তেলের মতো জ্বালানির ব্যবহার চলতে থাকে, তবে হয়তো আরো 40 থেকে 50 বছর চলতে পারে অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে। কিন্তু তারপর কী হবে? তাই শক্তির অপব্যবহার কমাতে হবে।

উপযুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা বা খনিজ তেল থেকে অন্যান্য কম দূষক জ্বালানি তৈরি করা যেতে পারে। এভাবে কয়লা বা খনিজ তেলের প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের আয়ু দীর্ঘায়িত করা যাবে।

অন্য আরো একটা জ্বালানি কী হতে পারে বলো তো? ............................................................।

মাটির তলায় বা পাহাড়ের ফাটলে আবদ্ধ জ্বালানি গ্যাসের উৎস থেকে যে গ্যাস আমাদের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা কাজে লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের মতো নদীমাতৃক দেশে গভীর নলকূপের জল সেচের কাজে বা পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহার না করে, এই সমস্ত কাজে নদীর জল ব্যবহার করলে মাটির তলা থেকে জল তোলার জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত শক্তির অনেকটাই বাঁচানো যায়।

যেখানে সুবিধা আছে সেখানে জলপথে পরিবহণের যন্ত্রহীন নৌকার ব্যবহার বাড়ানোর কথা ভাবা যেতে পারে। সাইকেলের মতো পরিবহণ — যার মধ্যে কোন জ্বালানি লাগে না, এরকম পরিবহণ আরো বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনে সাইকেলের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। তার জন্য রাস্তায় সাইকেল যাবার আলাদা পথ নির্দিষ্ট করা আছে।

আমোদপ্রমোদে অতিরিক্ত পরিমাণ শক্তি ব্যবহার না করে, মানব কল্যাণের কথা ভাবা প্রয়োজন।

অপ্রচলিত পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সচেতনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

# 2 সময় ও গতি

## গতির ধারণা

নীচের বর্ণনাগুলি থেকে উপযুক্ত উত্তর বেছে নিয়ে সারণিটি পূর্ণ করো।

1. সরলরৈখিক গতি 2. বৃত্তাকার পথে গতি 3. ঘূর্ণন গতি
4. ঘূর্ণন ও সরলরৈখিক গতির মিশ্রণ 5. বক্রপথে গতি।

| বিভিন্ন ধরনের গতির উদাহরণ | কেমনভাবে গতিশীল |
|---|---|
| (1) রুলারের ধার বরাবর পেনসিল দিয়ে সোজা দাগ কাটার সময় পেনসিলের শিসের অগ্রভাগের গতি। | সরলরৈখিক গতি |
| (2) ঘড়ির কাঁটার অগ্রভাগের গতি। | |
| (3) ছাদ থেকে সামনের দিকে ছুড়ে দেওয়া পাথরের গতি | |
| (4) নাগরদোলার গতি | |
| (5) এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খেতে থাকা লাট্টুর গতি | |
| (6) ঘড়ির পেন্ডুলামের গতি | |
| (7) সোজা রাস্তা বরাবর চলন্ত গাড়ির গতি | |
| (8) সরলরেখা বরাবর চলন্ত সাইকেলের চাকার গতি | |
| (9) স্ক্রু-ডাইভারের গতি | |
| (10) বৈদ্যুতিক পাখার গতি | |

পাশে যে পাতার চিত্রটি আছে একটি পিঁপড়ে তার ধার বরাবর A থেকে B -তে যাচ্ছে। খাতায় তার গতিপথের চিত্র অঙ্কন করো।

পিঁপড়েটি যদি পাতার কিনারা ধরে না গিয়ে পাতার মোটা শিরা বরাবর A থেকে B -তে যেত তাহলে তার গতিপথের চিত্র কেমন হতো তা খাতায় আঁকো।

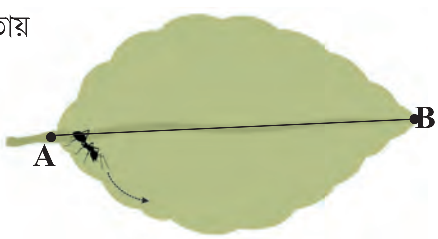


তোমার আঁকা চিত্র থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজো :

প্রথমে A থেকে B -তে যাওয়ার সময় পিঁপড়ের গতিপথের অভিমুখ কি সবসময় একই দিকে ছিল?

দ্বিতীয়বার তার গতির অভিমুখ কি সবসময় একই দিকে ছিল?

এইরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ ভাবার চেষ্টা করো যেখানে এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় বিভিন্ন পথে যাওয়া যায়। প্রত্যেকটি উদাহরণের কথা খাতায় লেখো ও তার গতিপথের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করো।

আগের আলোচনায় পিঁপড়েটি প্রথমে যে পথে পাতার কিনারা বরাবর A থেকে B -তে পৌঁছোল তার সমগ্র দৈর্ঘ্য হলো পিঁপড়ের প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব। এক্ষেত্রে পিঁপড়েটি যদিও AB সরলরেখা ধরে যায়নি, তবু AB সরলরেখার দৈর্ঘ্য এই যাত্রার একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়। A থেকে B এর দিকে AB সরলরেখার এই মাপকে বলে সরণ। এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব ও সরণের মাপ আলাদা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে A থেকে নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে সরাসরি B -তে যাওয়ার যে পথ, তার দৈর্ঘ্য এবং ওই নির্দিষ্ট দিক একত্রে উল্লেখ করলে তাকে বলা হয় সরণ। এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব আর সরণের মাপ একই, কারণ পিঁপড়েটি সত্যিসত্যি AB সরলরেখা ধরেই গিয়েছিল।

অতএব দেখলে যে, কোনো গতির সময় আসল যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য এবং সরণের দৈর্ঘ্য আলাদা হতে পারে বা একই হতে পারে। এই দুয়ের মধ্যে সরণ সরলরেখা বরাবর এবং তাই একটি নির্দিষ্ট দিক উল্লেখ করে গতির বর্ণনা দেওয়া যায়। যেমন A থেকে B -তে যাবার সময় যাত্রাপথ যখন পাতার ধার বরাবর, তখন পিঁপড়েটি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যাচ্ছে, ফলে এক এক সময় এক এক দিকে যাওয়ার প্রবণতা থাকছে। ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরলরেখাংশ এঁকে সরণ বুঝতে হচ্ছে। যেমন A থেকে P -তে বাঁকা পথে যাবার সময় AP সরলরেখাংশ এঁকে সরণ বুঝতে হবে। P থেকে Q -তে বাঁকা পথে যাবার সময় PQ সরলরেখাংশ এঁকে সরণ বুঝতে হবে।

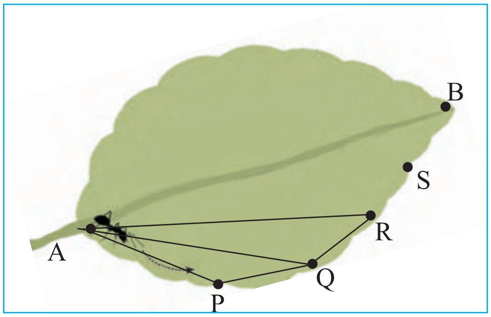


ফলে, A থেকে যাত্রা শুরুর সময় পিঁপড়েটির যাবার প্রবণতা P -এর দিকে, আবার P বিন্দু দিয়ে যাবার সময় যাবার প্রবণতা Q -এর দিকে ........ ইত্যাদি। অতএব, আঁকাবাঁকা যাত্রাপথে, চলার দিক ঠিক কোনটি তা হয়তো ওই মুহূর্তে বলা যায়, কিন্তু শেষ অবধি ঠিক কোন দিকে যাওয়া হলো তা যাত্রাপথের শেষ বিন্দুটি না জানলে বলা যায় না। শেষ বিন্দুটি জানা হয়ে গেলে তখন বলা যায় যে, A থেকে B -এর দিকে যাওয়া হয়েছে। বোঝা গেল যে, সরণ জানা থাকলে তবেই যাত্রার অভিমুখ বলা যায়, অন্যথায় নয়।

ছবিতে যেমন দাগ দেওয়া আছে সেইরকমভাবে A থেকে B -তে যাওয়া হলে সরণ AB এবং তা A থেকে B -এর দিকে, তেমনি A থেকে P -তে যাওয়া হলে সরণ AP এবং তা A থেকে P -এর দিকে।
একইভাবে P থেকে Q -তে যাবার সময়, সরণ PQ এবং তা P থেকে Q -এর দিকে ইত্যাদি।

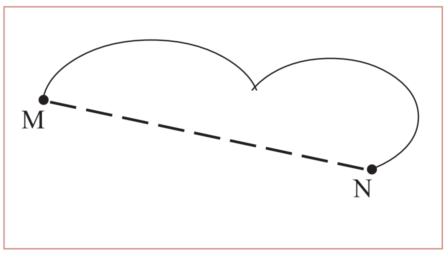


তাহলে, কোনো একটি বস্তু যদি একটি বিন্দু M থেকে অন্য একটি বিন্দু N পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে যাত্রা করে, আমরা বস্তুটির যাত্রাপথের দু-রকম দৈর্ঘ্যের হিসাব করতে পারি। একটি হলো আঁকাবাঁকা পথটির মোট দৈর্ঘ্য, আর অন্যটি হলো MN সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য, যদিও বস্তুটি MN সরলরেখা ধরে সত্যি সত্যি যাত্রা করেনি। এই MN সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য হলো বস্তুটির সরণের মাপ।

## দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ

যে-কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে একটা সময় লাগে। ঘড়ি ধরে সেই সময় মাপাও যায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন, দূরত্ব

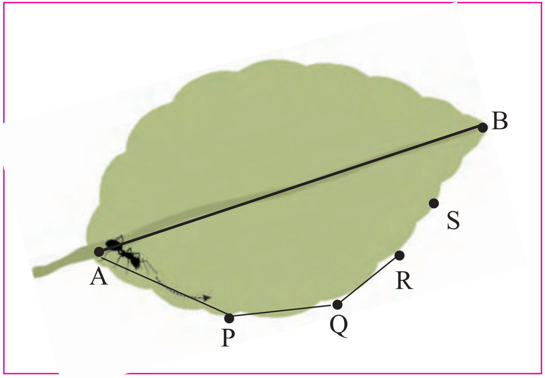


বলতে আমরা ঠিক কি বুঝব? A থেকে P -তে যাবার সময় পাতার ধার ধরে গেলে বাঁকা রাস্তার পরিমাপ, না কি, A থেকে P পর্যন্ত সরলরেখাংশ AP -র পরিমাপ? একইভাবে A থেকে B -তে যাওয়ার সময় পাতার ধার বরাবর আঁকাবাঁকা পথটির পরিমাপ, না কি AB সরলরেখাংশের পরিমাপ? — আমরা যদি বক্র পথটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে সেই দূরত্বকে আমরা বলি প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং যদি সরলরেখাংশ বরাবর দৈর্ঘ্য মাপি তাকে বলি সরণ। এবার যদি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব কীভাবে বদলাচ্ছে তা হিসাব করতে চাই তাহলেও দু-ভাবে তা করতে পারি— সময়ের সঙ্গে প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব কীভাবে বদলাচ্ছে এবং সরণ কীভাবে বদলাচ্ছে। দুটি হিসেব কিন্তু এক না-ও হতে পারে।

একটি উদাহরণ

| যাত্রাপথের মাপ | | যেতে সময় লেগেছে |
|---|---|---|
| প্রকৃত দূরত্ব (সেমি) | সরণ (সেমি) | |
| Aথেকে P = 5 | AP = 2 | 5 সেকেন্ড |
| Aথেকে Q = 10 | AQ = 3 | 10 সেকেন্ড |
| Aথেকে R = 15 | AR = 4 | 15 সেকেন্ড |

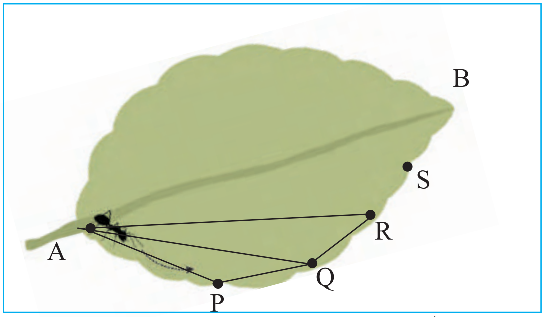


এখন যদি কেউ জানতে চায় যে প্রতি সেকেন্ডে পিঁপড়েটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তাহলে দুটি উত্তর হতে পারে— একটিতে দূরত্ব বলতে প্রকৃত দূরত্ব, আর অন্যটিতে দূরত্ব বলতে সরণের মাপ ধরলে উত্তর আলাদা হবে, যদিও একই পিঁপড়ের একই গতি নিয়ে হিসেব হচ্ছে।

5 সেকেন্ডে পিঁপড়ের প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব 5 সেমি

অতএব 1 সেকেন্ডে পিঁপড়েটির প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব $= \frac{5\text{সেমি}}{5} = 1$ সেমি

একই সঙ্গে বলা যায়, 5 সেকেন্ডে পিঁপড়েটির সরণ 2 সেমি

অতএব 1 সেকেন্ডে পিঁপড়েটির সরণ $= \frac{2\text{সেমি}}{5} = 0.4$ সেমি

প্রথম হিসেবটিকে বলে গড় দ্রুতি এবং দ্বিতীয়টি হলো গড়বেগ। ‘গড়’ বলার কারণ এই যে, আমরা কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই হিসেবে করছি না। সময়ের একটি ব্যবধানে এই হিসেবে করছি। এই 5 সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিটি 1 সেকেন্ডে পিঁপড়েটি কি সমান দূরত্ব গেছে? না কি প্রথম 1সেকেন্ডে যতটা গেছে, পরের 1 সেকেন্ডে তার চাইতে বেশি গেছে, তারপরের 1 সেকেন্ডে একটু কম গেছে ........ এরকম বিভিন্ন 1 সেকেন্ডে আলাদা আলাদা দূরত্ব গেছে? আমরা যে হিসেবে উপরে অঙ্ক কষে বের করলাম তাতে কিন্তু একটি হিসেবই বেরিয়েছে— প্রতি 1সেকেন্ডে সরণ হয়েছে 0.4 সেমি এবং সেটা ওই 5 সেকেন্ডের ভেতরকার সব 1 সেকেন্ডের জন্য একই। প্রকৃত দূরত্বের বেলাতেও তাই। প্রতি 1 সেকেন্ডে 1 সেমি করে। এই যে আমরা একটা সার্বিক হিসেব পেলাম, ভেতরের আসল খুঁটিনাটি জানতে পারলাম না, সেজন্য এই হিসেব হলো গড় হিসেব।

কোনো গতিশীল বস্তু এক সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করল (তা সে প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্বই হোক বা সরণই হোক) তা থেকে বস্তুটি কত দ্রুত চলছে তার হিসেব পাওয়া যায়।

ট্রেনে বা বাসে চড়ার সময় তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, প্রথম চালু হবার পর ট্রেন বা বাসের গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে অর্থাৎ আরো বেশি জোরে চলতে থাকে। এই সময় ট্রেন বা বাসের বেগ আগে যা ছিল পরে তার চাইতে বেশি হয়। ঠিক তেমনি যখন স্টেশনে বা বাস স্টপে থামার দরকার হয় তখন গাড়িটির গতি ক্রমশ কমতে থাকে। এক সেকেন্ডে আগে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করছিল পরে তার চাইতে কম দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ আগে যা বেগ ছিল পরে সেই বেগ কমে যায়।

বেগ বাড়তে অথবা কমতে থাকার সময় এক সেকেন্ডে বেগ কতটা বাড়ল বা কতটা কমল তার পরিমাণকে বলে ত্বরণ (Acceleration)। তুমি একটা সাইকেলে চড়ে এক সেকেন্ডে 5 মিটার বেগে চলছিলে। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখে তুমি বুঝতে পারলে বৃষ্টি আসছে। বৃষ্টি নামার আগে বাড়িতে পৌঁছোতে হলে বেগ বাড়াতে হবে। অবশেষে বেগ বাড়িয়ে 1 সেকেন্ডে 8 মিটার করলে। এই বেগ বাড়াতে তোমার সময় লাগল 3 সেকেন্ড।

তাহলে, প্রথমে তোমার বেগ ছিল প্রতি সেকেন্ডে 5 মিটার অর্থাৎ 5 মি/সেকেন্ড

3 সেকেন্ড পর তোমার বেগ হলো প্রতি সেকেন্ডে 8 মিটার অর্থাৎ 8 মি/সেকেন্ড

3 সেকেন্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন = (পরের বেগ) – (আগের বেগ) = (8 মি/সেকেন্ড) - (5 মি/সেকেন্ড) = 3 মি/সেকেন্ড

অতএব, 1 সেকেন্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন $= \frac{3 \text{ মি/সেকেন্ড}}{3} = 1$মি/সেকেন্ড।

$\therefore$ এক্ষেত্রে বেগ পরিবর্তনের হার = 1 মি/সেকেন্ড$^2$।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার ত্বরণ = 1 মি/সেকেন্ড$^2$।

যখন তুমি বাড়ির অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তখন সাইকেলের ব্রেক কষলে সাইকেলের বেগ কমতে থাকল। এইভাবে 2 সেকেন্ড পর সাইকেল নিয়ে তুমি বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লে।

অর্থাৎ এখন তোমার সাইকেলের বেগ হলো শূন্য (zero)।

এক্ষেত্রে প্রথমে তোমার বেগ ছিল 8 মি/সেকেণ্ড।

2 সেকেণ্ড পর তোমার বেগ হলো 0 মি/সেকেণ্ড।

2 সেকেণ্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন = (পরের বেগ) – (আগের বেগ)

= 0 মি/সেকেন্ড – 8 মি/সেকেন্ড

= – 8 মি/সেকেন্ড

অতএব, 1 সেকেন্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন $= \frac{-8 \text{ মি/সেকেন্ড}}{2}$

= – 4 মি/সেকেন্ড

$\therefore$ এক্ষেত্রে বেগ পরিবর্তনের হার = – 4 মি/সেকেন্ড$^2$

এক্ষেত্রে ত্বরণ ঋণাত্মক। একে **ঋণাত্মক ত্বরণ** বা **মন্দন** (Retardation) বলে।

এই যে আমরা ত্বরণ হিসেব করলাম, এটাও কিন্তু গড় হিসেব। একটি সময়ের ব্যবধানে করা সামগ্রিক হিসেব, নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তের হিসেব নয়।

## বলের ধারণা ও নিউটনের গতিসূত্রের ধারণা, বলের পরিমাপ

একটা রবারের বলকে সমান মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে দাও। এবার ফিতে বা স্কেল দিয়ে মেপে দেখো বলটা কতদূর গেল।

এখন ঘাস আছে এমন মাঠের উপর দিয়ে ওই বলটাকে একই জোরে গড়িয়ে দাও। এবারও মেপে দেখো বলটা কতদূর গেল।

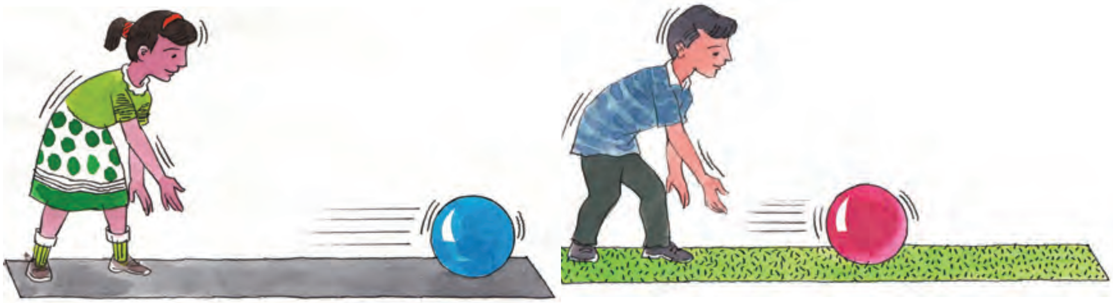

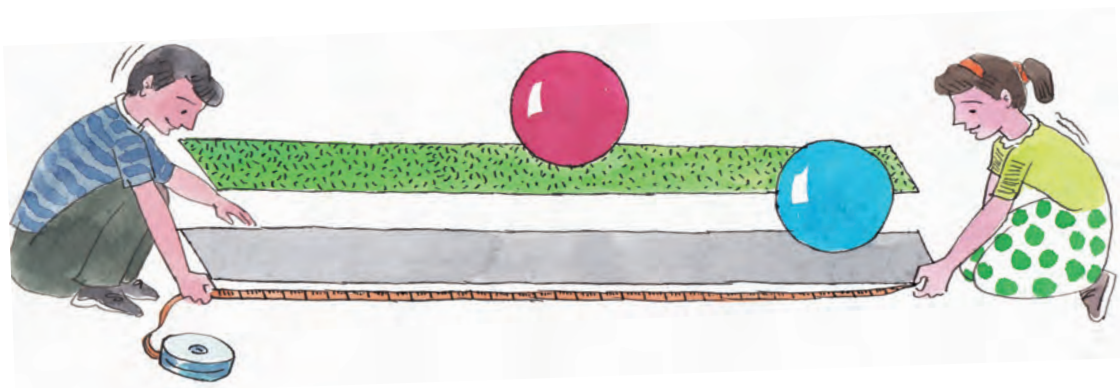

মেঝের উপর দিয়ে বলটা যতদূর গেল, ঘাসের উপর দিয়ে ততটা যেতে পারল না কেন?

বলটা (Ball) দুই ক্ষেত্রেই এক সময় থেমে গিয়েছিল। তাহলে কি বলটা গড়াবার সময় বাধা পেয়েছিল? বলটা চলতে বাধা পেয়েছিল বলেই কি থেমে গেল?

কোন ক্ষেত্রে বলটা (Ball) বেশি বাধা পেয়েছিল?

ভেবে বলো তো বল (Ball)টা যদি কোনো বাধা না পেত তবে কী হতো?

## হাতেকলমে 1

টেবিলের উপর একটা বাঁধানো বই রাখো।
এবার বইটাকে বাঁ হাত দিয়ে পাশ থেকে ডানদিকে ঠেলো।

বইটা কোন দিকে সরে গেল?

এবার একইরকমভাবে বইটাকে ডান হাত দিয়ে উলটোদিকে ঠেলো।

এবার বইটা কোন দিকে সরলো?

এবার, দু-হাত দিয়ে বইটার দু-পাশ থেকে পরস্পর উলটো দিকে ঠেলো। এমনভাবে ঠেলো যাতে বইটা কোনো দিকেই সরে না যায়।

ভেবে দেখো বইটা কোনোদিকেই না সরে যাওয়ার কারণ কী?

যদি কোনো একদিকের ঠেলা, অন্য দিকে ঠেলার চেয়ে বেশি জোরালো হতো, তবে কী হতো? এরকম ঠেলা বা ধাক্কা-কে আমরা বলি **বল (force)**।

তাহলে দেখা গেল, কোনো বস্তুর ওপর পরস্পর বিপরীত দিক থেকে সমমানের বল (force) প্রয়োগ করলে, বস্তুটার ওপর '**সার্বিক বল**' শূন্য হয়ে যায়।

রঞ্জনা পড়ার টেবিলে পড়তে বসে ভাবে ওর বিজ্ঞান বইটাকে যদি ও কোনোদিন না সরায় এবং অন্য কেউও যদি তা না করে তবে ওর বিজ্ঞান বইটা কী চিরকালই ওই অবস্থায় থাকবে?

ভেবে দেখো, রঞ্জনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারো কিনা।

টেবিলের উপরে রাখা তোমার বিজ্ঞান বইটা তুমি সরাতে চাইলে তোমাকে কী করতে হবে?

বল প্রয়োগে বস্তুর গতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন। চলো ওই সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

**স্যার আইজাক নিউটন**

1642 খ্রিস্টাব্দে 25 ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের উলসথর্প গ্রামে এক চাষির পরিবারে জন্ম। 1665 খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। 1669 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 27 বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন।

**তাঁর গতিসূত্র, মহাকর্ষসূত্র, সূর্যরশ্মির বর্ণালি, আলোর কণিকাতত্ত্ব, দ্বিপদ উপপাদ্য, ক্যালকুলাস** বিজ্ঞান ও গণিতের জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তিনি 1672 খ্রিস্টাব্দ থেকে টানা 25 বছর রয়্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। 1727 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'প্রিন্সিপিয়া'।**

## নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের ধারণা :

কোনো বস্তুর ওপর যদি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে—

(i) স্থির বস্তু চিরকাল স্থিরই থেকে যাবে,

(ii) আর গতিশীল বস্তু আগে থেকেই যে দিকে যে বেগ নিয়ে চলছিল সেদিকে সেই বেগ নিয়ে চিরকাল চলতে থাকে।

তাহলে দেখা গেল যে,

বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হলে, কোনো স্থির বস্তু হয় চিরকাল স্থির, বা সমবেগে সরলরেখা বরাবর গতিশীল কোনো বস্তু চিরকাল ওই একই গতিতে একই সরলরেখা ধরে চলতে থাকে। স্থির থাকা বা একই বেগে চলতে থাকার এই ধর্মকে বলে বস্তুর **জাড্য**। স্থির থাকার ধর্মকে **স্থিতিজাড্য**। আর সমবেগে গতিশীল থাকার ধর্মকে **গতিজাড্য** বলা হয়। আর বাইরে থেকে যা প্রয়োগ করলে এই অবস্থা বদলে দেওয়া যায় তাকে বলে **বল**।

## আমাদের প্রতিদিনের জীবনে জাড্য

(1) স্থির বাস হঠাৎ চলতে আরম্ভ করলে কোনো কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রী পিছনদিকে হেলে পড়ে। কোনো কিছু ধরে থাকা যাত্রীদেরও ওই একইরকম অনুভূতি হয়। থেমে থাকা বাসে যাত্রীরাও থেমে থাকে। সব কিছু তখন স্থির অবস্থায় রয়েছে। বাস হঠাৎ চলতে শুরু করল, ফলে বাসের স্থির অবস্থা পালটে গেল। বাসের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের পা চলতে শুরু করল কারণ পা বাসের মেঝের সংস্পর্শে আছে। কিন্তু যাত্রীদের বাকি শরীর স্থির থাকতে চাইল। অতএব পায়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোল না। যাত্রীরা তাই পিছনের দিকে হেলে পড়ল।

(2) তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ কাক (বা অন্য কোনো পাখি) উড়তে উড়তে ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে দিয়েও দিব্যি ডানা মেলে বাতাসে ভাসতে ভাসতে অনেকটা এগিয়ে যায়—

ডানা ঝাপটানো বন্ধ করেও কাকটা কি করে ভাসতে ভাসতে অতটা এগিয়ে গেল বলো তো?

পাখিটা যখন উড়ছে তখন সে গতিশীল, ফলে পাখি উড়তে উড়তে ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে দিলেও তার গোটা শরীরটা গতিজাড্যের জন্য তখনও সমবেগ বজায় রাখতে চেষ্টা করে, ফলে পাখিটা শুধু ডানা মেলে (না ঝাপটিয়েও) অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারে।

**হাতেকলমে 2**

তোমার টেবিলের ফাঁকা ড্রয়ারটার বেশিরভাগ অংশটা খোলো। এবার একটা পেনসিল পাশের ছবির মতো করে রাখো।

পেনসিলটাকে দেখা যায় এমনভাবে রেখে ড্রয়ারটা একটু জোরে বন্ধ করো। আবার খোলো।

কী দেখতে পেলে?

বন্ধ করার সময় পেনসিলটা কোন দিকে গড়াচ্ছে?

খোলার সময় পেনসিলটা কোন দিকে গড়াচ্ছে?

কেন এমন হলো?

**হাতেকলমে 3**

একটা খাতার পাতা যত বড়ো হয় তত বড়ো কাগজ নাও। ছবির মতো করে কাগজটা টেবিলের ওপর রাখো। এবার ওই কাগজের ওপরে তোমার পেনসিল বাক্সটা রাখো। এখন ওই কাগজের একটা প্রান্ত ধরে কাগজটাকে এক ঝটকায় এমনভাবে টানো যাতে পেনসিল বাক্সটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকে এবং নড়ে না যায়।

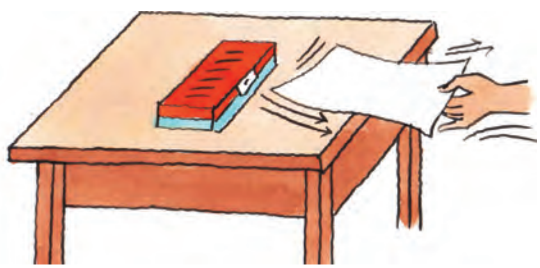

ভেবে বলো তো এরকম হলো কেন? নিউটনের প্রথম সূত্রে তোমরা জাড্য ধর্মের কথা জেনেছ। ওই সূত্র ব্যবহার করে এই ঘটনা কেন ঘটল বলতে পারো কি?

ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো তো নীচের ঘটনাগুলোতে জাড্য ধর্ম (গতিজাড্য বা স্থিতিজাড্য) খুঁজে পাও কিনা? বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো।

কুলো দিয়ে চাল ঝাড়া (চাল থেকে ধানের তুষ বার করা) হয়।

চলন্ত অটোরিকশা হঠাৎ বাধ্য হয়ে ব্রেক কষে থেমে গেলে, যাত্রীরা সামনের দিকে (অটোরিকশার গতির দিকে) ঝুঁকে পড়ে।

সাইকেল চালাতে চালাতে পা চালানো থামিয়ে দিলেও সাইকেল সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় না, পা না চালিয়েও বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

কোটের ধুলো ঝাড়তে কোটকে ঝাড়া দেওয়া হয়।

ধুলোমাখা কোটের উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলে (খুব জোরে নয়) ধুলো কোট থেকে আলাদা হয়ে পড়ে।

স্পোর্টসের মাঠে লং জাম্প দেবার সময়, প্রতিযোগী অনেকটা দূর থেকে দৌড়ে আসে।

দেয়ালের গায়ে ডাস্টার ঝাড়া হয়।

## নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের ধারণা :

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে আমরা জেনেছি, বাইরে থেকে 'বল' প্রয়োগ করা হলে একটি বস্তুর বেগ বদলে যায়। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসরণ করে বলা যায় , (i) একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা বল যত বাড়ানো হবে, 1 সেকেন্ডে বস্তুটির বেগের পরিবর্তনও (অর্থাৎ ত্বরণ) তত বাড়বে। প্রযুক্ত বলের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে, উৎপন্ন ত্বরণও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ বল ও ত্বরণ -এর মধ্যে সরল সম্পর্ক রয়েছে।

(ii) বল প্রয়োগের অভিমুখ যে দিকে, উৎপন্ন ত্বরণের অভিমুখও সেই দিকে। অর্থাৎ প্রযুক্ত বলের দিকেই বস্তুর বেগ বৃদ্ধি পায়।

## নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসরণ করে প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয়ের সমীকরণ :

প্রযুক্ত বল = বস্তুর ভর × এক সেকেন্ডে বস্তুর বেগের পরিবর্তন

= বস্তুর ভর × বস্তুতে উৎপন্ন ত্বরণ (যেহেতু, 1 সেকেন্ডে বেগের পরিবর্তন = ত্বরণ)

$F = m \times a$ [F-বল, m-ভর, a- ত্বরণ]

SI পদ্ধতিতে বলের (Force) একক 1 নিউটন। 1 নিউটন = 1kg × 1 মিটার/সেকেন্ড$^2$

## নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের ধারণা :

রেশমা দিদিমণির সঙ্গে গিয়েছিল কলকাতায়। বাড়িতে ফেরার পথে রেশমা যখন সবার শেষে লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নামল তখন রেশমা অবাক হয়ে গেল — কী আশ্চর্য, নৌকাটা জলে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন?

দিদিমণি বললেন, ভালো করে ভেবে দেখো, নৌকাটা তো আর এমনি এমনি সরে যায়নি।

রেশমা বলল, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ নৌকাটাকে পিছনদিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে কে ঠেলল? আমিই তো সব শেষে নামলাম।

তবে তুমিই বল প্রয়োগ করেছ। কারণ তুমি আর নৌকা ছাড়া সেখানে তৃতীয় কেউ তো ছিল না।

আমি তো লাফ দিয়ে নেমেছিলাম! ও ! বুঝতে পেরেছি আমি লাফ দিয়ে নামার সময় নৌকাটাকে তো পিছনদিকে ঠেলেছিলাম।

ঠিক ধরেছ, ওই ঠেলাই নৌকাটাকে পিছনদিকে সরিয়ে দিয়েছে।

তাহলে আমি কীভাবে সামনের দিকে লাফাতে পারলাম? আমাকে তো কেউ সামনের দিকে ঠেলে দেয়নি!

দিদিমণি হেসে বললেন, তোমার প্রশ্নেই তোমার উত্তর লুকিয়ে আছে।

আমার প্রশ্নে কী উত্তর লুকিয়ে আছে দিদি, আর একটু পরিষ্কার করে বলবেন।

তার মানে তোমাকে কেউ ঠেলেছেই ঠেলেছে।

আমার পিছনে নৌকা ছাড়া আর তো কেউ ছিল না! তাহলে কি নৌকাটাই আমাকে ঠেলল।

একদম ঠিক। ওই নৌকাই, তোমার দেওয়া বলের ঠিক উলটো দিকে, সমান জোরে, তোমার পায়ে বলপ্রয়োগ করেছে। আর ওই বল তোমাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভারি মজার ব্যাপার তো। তাহলে আমি যেখানেই বল প্রয়োগ করি না কেন, সেও আমায় সমান জোরে আমার দেওয়া বলের উলটোদিকে বল প্রয়োগ করবে?

স্যার আইজাক নিউটন তাঁর তৃতীয় গতিসূত্রে সে কথাই তো বলেছেন।

কী রকম?

নিউটন বলেছেন — ' **প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী একটা প্রতিক্রিয়া বল আছে।**'

তাহলে দিদি আমার আর নৌকার বলের মধ্যে কোনটা '**ক্রিয়া**' আর কোনটা '**প্রতিক্রিয়া**'?

আসলে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া ওভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ 'ক্রিয়া' আর 'প্রতিক্রিয়া'

সবসময় একসঙ্গেই ঘটে। একটা আগে আর একটা পরে, এভাবে নয়। তাই যে-কোনো একটা 'ক্রিয়া' হলে, অন্যটা হবে তার 'প্রতিক্রিয়া'।

তাহলে দিদি এই **'ক্রিয়া' আর 'প্রতিক্রিয়া' আলাদা আলাদা বস্তুর উপর কাজ করে**, তাই না।

ঠিক ধরেছ, তোমার বল প্রয়োগ হয়েছে নৌকার ওপর, আর নৌকার বল প্রয়োগ হয়েছে তোমার পায়ের উপর।

নীচের ঘটনাগুলোতে নিউটনের তৃতীয় সূত্র কীভাবে কাজ করছে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো।

1. আমরা যখন হাঁটি

2. জলে মাছ সাঁতার কাটে।

## শক্তি ও কার্য

তুমি অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে, তোমার কাজ করার সামর্থ্য কমে যায়।

এরপর যখন তুমি খাবার খাও তখন আবার কাজ করার 'সামর্থ্য' ফিরে পাও কি?

খাবার থেকে আমরা নিশ্চয়ই এমন কিছু পাই যা আমাদের **'কাজ করার সামর্থ্য'** জোগায়। খাবার থেকে আমরা পাই শক্তি। **কাজ করার সামর্থ্যই হলো শক্তি**।

1) মোটামুটি ভারী 10টা বই আর 10টা খাতা জোগাড় করো। তোমার স্কুলের ব্যাগের মধ্যে 10টা বই আর 10টা খাতা ভরো। এবার ব্যাগটা মেঝে থেকে চেয়ারের উপর তোলো। তারপর ব্যাগটা মেঝে থেকে আলমারির উপর তোলো।

এখন বলো(i) পৃথিবীর টানের (মানে ব্যাগের ওজনের) উলটোদিকে ব্যাগটাকে ওঠাতে দুই ক্ষেত্রেই কী তোমাকে সমান **'বল'** প্রয়োগ করতে হয়েছে?

(ii) কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি **'পরিশ্রম'** করতে হয়েছে?

2) তুমি তোমার ওই স্কুল ব্যাগে আবার 10টা বই 10টা খাতা নাও। এখন ব্যাগটা মেঝে থেকে টেবিলে তোলো। এবার ব্যাগ থেকে 10টা খাতা ও 5 টা বই নামিয়ে রাখো। তারপর আবার মেঝে থেকে ব্যাগটা টেবিলে তোলো।

এখন বলো (i) ব্যাগের ওজনের উলটোদিকে কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি **'বল'** প্রয়োগ করতে হলো?

(ii) কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি '**পরিশ্রম**' করতে হলো ?

1 নং পরীক্ষায় দেখা গেল একই ওজনের বস্তুকে যত বেশি উঁচুতে তোলা যায় তত বেশি পরিশ্রম করতে হয়। যদিও দুই ক্ষেত্রেই সমান সমান বল প্রয়োগ করতে হয়েছে।

2 নং পরীক্ষা থেকে দেখা গেল বিভিন্ন ওজনের বস্তুকে একই উচ্চতায় তোলার সময় যে বস্তু যত বেশি ভারী তার জন্য তত বেশি বল লাগে ও পরিশ্রমও বেশি করতে হয়।

1 ও 2 নং পরীক্ষা দুটির অভিজ্ঞতা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে সাধারণভাবে যে কাজে '**পরিশ্রম বেশি**' সে কাজের জন্য তোমার **শক্তিও বেশি খরচ করতে হয়**।

যেখানে '**শক্তি বেশি**' খরচ করতে হয় সেখানে কাজের পরিমাণও বেশি হয়।

তাহলে দেখা গেল যে ক্ষেত্রে বেশি উঁচুতে বস্তুকে তোলা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণও বেশি হচ্ছে (1 নং পরীক্ষা)।

আবার যেখানে '**বেশি বল**' প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেখানেও '**কাজের পরিমাণ**' বেশি হচ্ছে (পরীক্ষা নং 2)

তাহলে ভেবে দেখত কাজের পরিমাণ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করছে ?

পদার্থবিজ্ঞানে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্যে নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয় -

কাজের পরিমাণ = (প্রযুক্ত বল) × (প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুর সরণের পরিমাণ)

$$W = F \times d$$

**W** = কাজ

**F** = বল

**d** = সরণ

## SI পদ্ধতিতে কাজ মাপার একক

এক নিউটন বল প্রয়োগ করে যদি একটি বস্তুকে বল প্রয়োগের দিকে এক মিটার সরানো হয় তবে এক জুল পরিমাণ কাজ করা হয়েছে বলা হয়। এক জুল হলো কাজ পরিমাপের SI একক।

$$W = F \times d$$

1জুল = 1নিউটন × 1মিটার

**আরো কিছু পরীক্ষা :**

উপকরণ: দুটো দুই কিলোগ্রামের আর একটা এক কিলোগ্রামের বাটখারা, দুটো সমান উচ্চতার টেবিল।

1) তুমি আর তোমার বন্ধু মেঝেতে রাখা একটা করে 2 কিলোগ্রামের বাটখারা নিয়ে একই টেবিলের উপর

তুলে রাখলে। — তাহলে তুমি আর তোমার বন্ধু **'সমান পরিমাণ'** কাজ করলে।

2) এবার মেঝেতে একটা 2kg আর একটা 1kg -র বাটখারা রাখো। এখন, তুমি 2kg -র বাটখারাটি নিয়ে টেবিলের উপর তুলে রাখলে। আর তোমার বন্ধু 1kg -র বাটখারাটি টেবিলের উপর তুলে রাখল।— তাহলে তুমি, তোমার বন্ধুর কাজের 2 গুণ কাজ করেছ।

3) একটা টেবিলের উপর আর একটা সম উচ্চতার টেবিল বা সম উচ্চতার টুল উঠিয়ে রাখা হলো। মেঝের উপর দুটো 2 kg -র বাটখারা আছে।

এবার তুমি মেঝে থেকে একটা বাটখারা নিয়ে নীচের টেবিলে তুলে রাখো।

তোমার বন্ধু অন্য বাটখারাটি নিয়ে উপরের টেবিলের উপর রাখল। —স্বভাবতই এখানে তোমার বন্ধু তোমার কাজের 2-গুণ কাজ করেছে।

4) একটা স্প্রিং নিয়ে দু-দিক থেকে টান দাও ।

কি দেখতে পেলে?

স্প্রিংটা কি সামগ্রিকভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করল? না কি স্প্রিংটার শুধুমাত্র আকৃতির পরিবর্তন হলো?

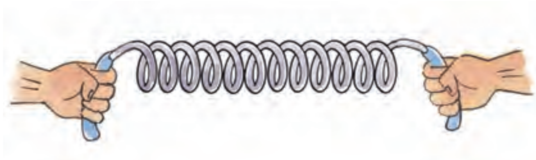

এক্ষেত্রে বল প্রয়োগের ফলে কাজ হলো কি?

বল প্রয়োগের ফলে কোনো বস্তুর সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন না হলেও যদি বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিবর্তন হয় তাহলেও বলা হয় প্রযুক্ত বল কাজ করেছে।

5) ছবির মতো দেখতে একটি পিচকিরি নাও, সেটির মুখে একটি বেলুন ছবির মতো করে আটকাও। এবার পিচকিরির হাতলটি ভেতর দিকে ঠেলো।

কী দেখতে পেলে?

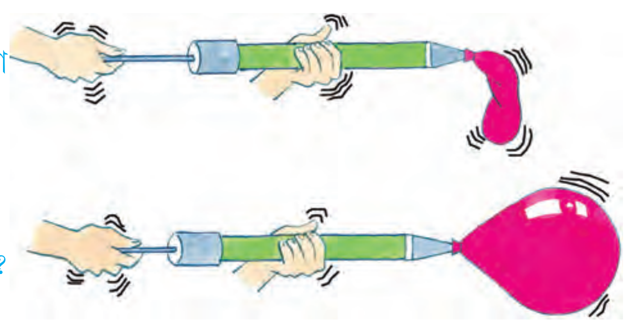

বেলুন লাগানো সমগ্র পিচকিরিটি কি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে গেল?

বেলুনটা ফুলল কেন?

তোমার বল কিসের ওপর প্রযুক্ত হলো?

তোমার প্রযুক্ত বলের দ্বারা কি কোনো কাজ হলো?

এক্ষেত্রেও দেখা গেল বল প্রয়োগের ফলে বস্তু সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করল না কিন্তু তোমার প্রযুক্ত বল পিচকিরির ভিতরে বায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করায় বায়ু সংকুচিত হয়ে পিচকিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে বেলুনের ভেতর প্রবেশ করেছে। ছোটো ছোটো সরণের ফলে বেলুনের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে বেলুন ফুলে উঠেছে। তাই এখানেও বল প্রয়োগের ফলে কাজ হয়েছে।

স্প্রিং -এর ক্ষেত্রেও স্প্রিং -এর সামগ্রিক সরণ না হলেও তার ভিতরকার ছোটো ছোটো অংশের স্থান পরিবর্তনের ফলে কাজ হয়েছে ($W=F\times d$), যা স্প্রিংটির আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

6) একটা চেয়ারে বসে জোরে শ্বাস নাও।

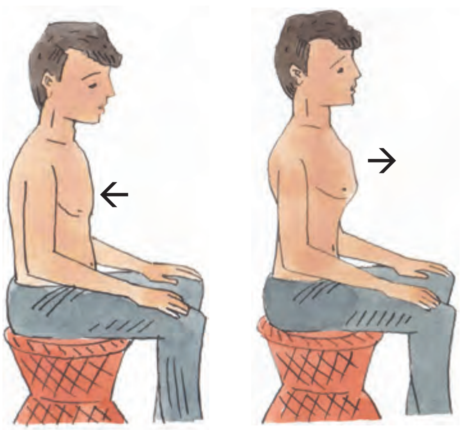

কিছু অনুভব করতে পারলে?

তোমার বুক কি উঠছে নামছে মনে হচ্ছে?

এই ওঠানামার জন্য **'বল'** কে প্রয়োগ করছে? কোথায় প্রয়োগ করছে?

এই বলের প্রভাবে কোনো কাজ হচ্ছে কি?

বুকে হাড় ও পেশি দিয়ে তৈরি একটা খাঁচা আছে, যার ভেতর থাকে ফুসফুস। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বিভিন্ন পেশির সংকোচন প্রসারণের ফলে ফুসফুসেরও সংকোচন-প্রসারণ হয়। ফলে ফুসফুসের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন হয়।

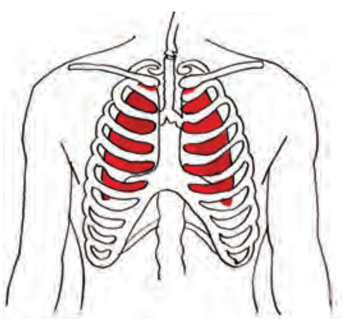

এখানে পেশির বলের দ্বারা কাজ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ফুসফুসের সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ সরণ হয় না — কিন্তু **'কাজ'** হয়ে থাকে।

যদি ভালোভাবে খেয়াল করো তবে বুঝতে পারবে যে, পেশির বল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল হয় ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর উপর। ফলে বায়ু শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে অথবা ভেতরে প্রবেশ করে এবং এভাবে **'কাজ'** সংঘটিত হয়। কিন্তু এসবের কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না বলে আমরা তা বুঝতে পারি না।

7) তুমি একটা দেয়ালকে অনেকক্ষণ ধরে ঠেললে।

তোমার দেওয়া বলের অভিমুখে দেয়ালের কি কোনো সরণ হয়েছে?

দেয়ালের আকার বা আয়তনের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

তুমি কি ক্লান্ত হয়েছ?

ঠেলার সময় তোমার হৃৎস্পন্দন কি বেড়ে গিয়েছে?

ঠেলার সময় কি তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে গিয়েছিল?

তোমার শরীরের কোনো অংশ কি গরম হয়ে গিয়েছিল?

দেয়ালে বল প্রয়োগ করার জন্য তোমার কি শক্তি খরচ করতে হয়েছে?

**শরীরের ক্লান্তি, হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি, গা গরম হওয়া ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে যে শরীরের ভেতর শক্তি খরচ হয়েছে।**

আবার যেহেতু কাজ করার সামর্থ্যকেই শক্তি বলে সেহেতু শক্তি যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন অবশ্যই কাজ হয়েছে।

এবার একটা চক নিয়ে দেয়ালের একটা অংশে ভালো করে ঘষো যাতে ওই জায়গাটা সাদা হয়ে যায়।

এখন ওই সাদা অংশে দেয়ালটাকে ঠেলো।

- দেয়ালটা কি সরলো?
- দেয়ালের ওই স্থানটা (যেখানে বল প্রয়োগ করেছিলে) কি ভেতরে ঢুকে গেল?
- দেয়ালের ওই স্থানের চকের গুঁড়োর কিছু অংশ কি উঠে গেছে? কোথায় উঠে গেছে?
- এবার তোমার হাতটা ভালো করে দেখো তো সেখানে (তালুতে) চকের দাগ লেগেছে কিনা?
- তুমি যখন দেয়ালটাকে ঠেলছিলে তখন কি তোমার হাতের তালুর মাংসপেশি কিছুটা চেপটে গিয়েছিল?
- এবার ভেবে বলো তো দেয়ালটা যদি রাবারের তৈরি হতো, তবে ঠেলার স্থানটা কি ভেতরে ঢুকে যেত?

দেয়ালে বল প্রয়োগ করার সময় যেমন হাতের তালুর মাংস পেশির আকারের পরিবর্তন হয়, তেমনই দেয়ালের ওই স্থানেও (চাপ দেওয়া স্থানে) আকৃতিগত কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন এত সামান্য যে তা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। সে কারণেই চকের গুঁড়ো ব্যবহার করে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে বল প্রয়োগে সেখানেও সরণ হয়। তাই তোমার হাতে চকের দাগ দেয়াল থেকে উঠে এসেছিল।

দেয়ালে বল প্রয়োগ করার জন্যে পেশিকোশে দরকার হয়ে পড়ে অতিরিক্ত শক্তি। কোশে কোশে শ্বসন কার্য বেড়ে যায়, ফলে খাদ্য ও অক্সিজেনের চাহিদাও বেড়ে যায়। এর ফলে বেড়ে যায় হৃৎস্পন্দন, বেড়ে যায় রক্তবাহে রক্তচাপ, বেড়ে যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার। পেশিকোশের দরকার শক্তি কিন্তু সেখানে অক্সিজেনের জোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম। শক্তির চাহিদা মেটাতে কোশে কোশে শুরু হয় এক বিশেষ ধরনের শ্বসন। তারফলেই পেশিকোশে জমতে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড। আর পেশিকোশে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড জমার ফলে পেশিতে ব্যথার অনুভূতি জাগে। শ্বসনের হার বেড়ে যাওয়ার জন্য তাপ শক্তিও বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তাই আমাদের শরীরও গরম হয়।

কিন্তু এতসব কি আমাদের চোখে পড়ে? তাই ওসব কাজ আমরা দেখতে পাই না, ঠিক যেমন পিচকিরির ভেতরকার কাজ, ফুসফুসের ভেতরকার কাজ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

# 3 পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

## চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা কিছু মৌলিক পদার্থের নাম ও চিহ্নের কথা জেনেছি। মৌলের চিহ্ন দিয়েই মৌলের সংক্ষেপে নাম বোঝায়। এখন তোমরা তার উপর ভিত্তি করে নীচের সারণিতে দেওয়া মৌলগুলোর নাম থেকে চিহ্ন লেখার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

সারণি - 1

| মৌলের নাম | নামের বানান | চিহ্ন |
|---|---|---|
| অ্যালুমিনিয়াম | Aluminium | .......... |
| নিকেল | Nickel | ........... |
| আর্সেনিক | Arsenic | ........... |
| সিলিকন | Silicon | ........... |
| জিঙ্ক | Zinc | ........... |
| বোরন | Boron | ........... |

সারণি - 2

| মৌলের নাম | ইংরাজি নাম | ল্যাটিন নাম | নামের বানান | চিহ্ন |
|---|---|---|---|---|
| টিন | Tin | স্ট্যানাম | Stannum | ........... |
| পারদ | Mercury | হাইড্রার্জিরাম | Hydrargyrum | Hg |
| সিসা | Lead | প্লাম্বাম | Plumbum | ........... |

এবার আমরা এমন কিছু মৌলিক পদার্থের নাম ও চিহ্ন শিখব, যেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নাম, মৌলগুলোর আবিষ্কারের স্থান বা যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন তাঁর দেশের নাম অথবা বিশেষ কিছু গ্রহের নামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে তুমি নীচের তিনটে সারণি পূরণ করো।

সারণি - 1

| মৌলের নাম | নামের বানান | বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম | চিহ্ন |
|---|---|---|---|
| কুরিয়াম | Curium | ............ | ............ |
| আইনস্টাইনিয়াম | Einsteinium | ............ | ............ |

সারণি - 2

| মৌলের নাম | নামের বানান | স্থানের নাম | চিহ্ন |
|---|---|---|---|
| আমেরিসিয়াম | Americium | ............ | ............ |
| পোলোনিয়াম | Polonium | ............ | ............ |

সারণি - 3

| মৌলের নাম | নামের বানান | গ্রহের নাম | চিহ্ন |
|---|---|---|---|
| ইউরেনিয়াম | Uranium | ............ | ............ |
| নেপচুনিয়াম | Neptunium | ............ | ............ |
| প্লুটোনিয়াম | Plutonium | ............ | ............ |

শব্দভাণ্ডার: Pu, America, Po, Uranus, Am, Madame Curie, Pluto, Es, No, Neptune, Albert Einstein, Np, U, Poland.

মৌলের পরমাণু জুড়ে মৌল অণু বা যৌগ অণু তৈরি হয়। তাহলে এসো আমরা দেখি, পরমাণু কীভাবে তৈরি।

পাশের ছবিতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়াম পরমাণুর গঠন কেমন তা দেখানো হয়েছে। পরমাণুর এই ছবির মধ্যে কত রকমের কণা তোমরা দেখতে পাচ্ছ?

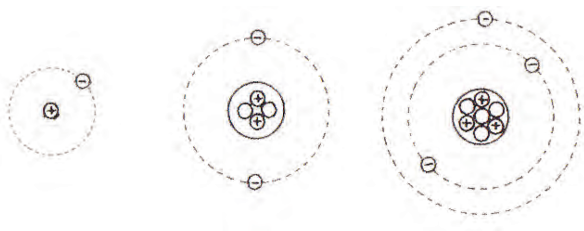

হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম

— তিনরকমের অতিক্ষুদ্র কণা পরমাণুতে থাকতে পারে। পরমাণুর মধ্যে এই তিনরকমের কণার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

⊕ দিয়ে দেখানো কণাগুলো প্রোটন, এগুলো ধনাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণা।

⊖ দিয়ে দেখানো কণাগুলো ইলেকট্রন। এগুলো ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা।

○ দিয়ে দেখানো কণাগুলো নিউট্রন। এদের কোনো তড়িৎ নেই।

একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের তড়িতের বা চার্জের পরিমাণ সমান। একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক চার্জ একত্রে থাকলে তড়িৎবিহীন বা নিস্তড়িৎ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ছবিতে আরো লক্ষ করো, প্রোটন আর নিউট্রনগুলো পরমাণুর কেন্দ্রে একটা ছোটো জায়গায় জোট বেঁধে আছে। ওই জায়গাটা হলো পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস। ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন পথে ঘোরে। যে পথগুলোতে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে তাদের কক্ষপথ বলে।

সাধারণ অবস্থায় সব মৌলের পরমাণুতেই প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয়। তাই মৌলের পরমাণু নিস্তড়িৎ। কোনো পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা তার পারমাণবিক সংখ্যা বলে।

একটি ইলেকট্রনের ভর প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের প্রায় 2000 ভাগের এক ভাগ। তাই নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভরই মোটামুটিভাবে কোনো পরমাণুর ভর — একথা বলা যেতেই পারে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাই ওই পরমাণুর ভরসংখ্যা।

এবার তোমরা আগের পাতার হিলিয়াম পরমাণুর গঠনের ছবি থেকে নীচের সারণি পূরণ করো।

| হিলিয়াম পরমাণুতে বিভিন্ন কণার সংখ্যা | | | পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক | ভরসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| প্রোটন | ইলেকট্রন | নিউট্রন | | |
| | | | | |

এবার এসো আমরা আরো কয়েকটা পরিচিত মৌলের পরমাণুর গঠনের ছবি দেখি: ছবিতে ⊕6 মানে 6টি প্রোটন, ○6 মানে 6 টি নিউট্রন এইভাবে বুঝতে হবে।

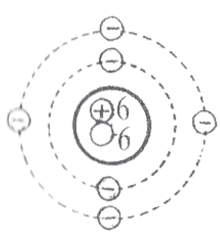

কার্বন

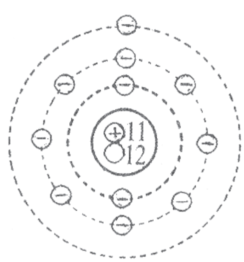

সোডিয়াম

ক্লোরিন

আগের পাতার ছবিগুলো দেখে নীচের সারণিটি পূরণ করো :

| মৌলের নাম | প্রোটন সংখ্যা | ইলেকট্রন সংখ্যা | নিউট্রন সংখ্যা | পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক | ভর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| কার্বন | | | | | |
| সোডিয়াম | | | | | |
| ক্লোরিন | | | | | |

মৌলের পরমাণু থেকে এক বা একের বেশি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে প্রোটন সংখ্যার থেকে ইলেকট্রন সংখ্যা কম হয়ে যায়। তখন ধনাত্মক (Positive) আধানযুক্ত আয়ন বা ক্যাটায়ন উৎপন্ন হয়। পরমাণু এক বা একের বেশি ইলেকট্রন নিয়ে নিলে কী হবে?

— তখন প্রোটন সংখ্যার থেকে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এবং ঋণাত্মক (Negative) আধানযুক্ত আয়ন তৈরি হবে। একে অ্যানায়ন বলা হয়।

সাধারণত ধাতু ও অধাতু জুড়ে যৌগ তৈরি হবার সময় ধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছাড়ে আর অধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

যেমন — সোডিয়াম পরমাণু একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে যে ক্যাটায়ন তৈরি হবে তাকে $Na^+$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তেমনি ক্যালশিয়াম পরমাণু 2টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে $Ca^{2+}$ ক্যাটায়ন তৈরি করবে।

আবার ক্লোরিন পরমাণু একটা ইলেকট্রন নিয়ে নিলে যে অ্যানায়ন উৎপন্ন হবে তাকে $Cl^-$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে ক্লোরাইড আয়ন বলে।

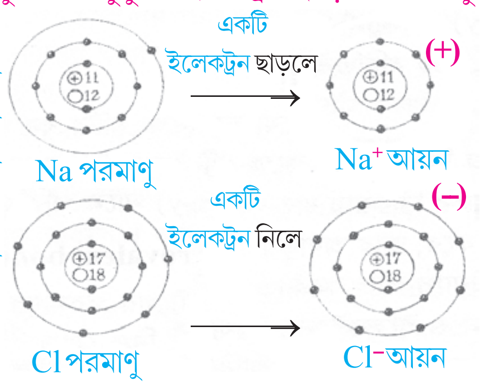


তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

| কোন মৌলের পরমাণু | মৌলের চিহ্ন | কটি ইলেকট্রন নিলে বা ছেড়ে দিলে | তৈরি হওয়া ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের চিহ্ন ও নাম |
|---|---|---|---|
| পটাশিয়াম | K | 1 টি ইলেকট্রন ছাড়লে | $K^+$ (পটাশিয়াম) |
| ম্যাগনেশিয়াম | ............ | 2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে | ............ |
| জিঙ্ক | ............ | 2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে | ............ |
| লেড | ............ | 2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে | ............ |
| অ্যালুমিনিয়াম | ............ | 3 টি ইলেকট্রন ছাড়লে | ............ |
| ফ্লুওরিন | F | 1 টি ইলেকট্রন নিলে | $F^-$ (ফ্লুওরাইড) |
| অক্সিজেন | ............ | 2 টি ইলেকট্রন নিলে | ....... (অক্সাইড) |
| সালফার | ............ | 2 টি ইলেকট্রন নিলে | ....... (সালফাইড) |
| ব্রোমিন | ............ | 1 টি ইলেকট্রন নিলে | ....... (ব্রোমাইড) |

আমরা জানি একাধিক মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। কখনো কখনো একই মৌলের এক বা একাধিক পরমাণু অথবা বিভিন্ন মৌলের পরমাণু জোটবদ্ধ অবস্থায় আয়নরূপে অবস্থান করে; তখন সাধারণভাবে তাদের মূলক বলা হয়। জোটবদ্ধ অবস্থাতেই ওই মূলকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। মূলকের আধানের পরিমাণই প্রাথমিকভাবে ওই মূলকের যোজ্যতা বলে ধরা যেতে পারে। পরে আমরা অন্য পদ্ধতিতে মূলকগুলোর যোজ্যতা কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা জানব।

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

| মূলকের নাম | সংকেত | তার আধান বা চার্জ | যোজ্যতা |
|---|---|---|---|
| নাইট্রেট | $NO_3^-$ | -1 | 1 |
| সালফেট | $SO_4^{2-}$ | ........ | ........ |
| কার্বনেট | $CO_3^{2-}$ | ........ | ........ |
| অ্যামোনিয়াম | $NH_4^+$ | +1 | 1 |
| বাইকার্বনেট | $HCO_3^-$ | ........ | ........ |
| ফসফেট | $PO_4^{3-}$ | ........ | ........ |
| হাইড্রক্সাইড | $OH^-$ | ........ | ........ |

এবার আমরা অন্য পদ্ধতিতেও মূলকগুলোর যোজ্যতা কীভাবে জানা যায় তা দেখব। আমরা জানি যে দুটো মৌলের পরস্পর যুক্ত হবার ক্ষমতাকে ওই মৌলদের যোজন ক্ষমতা বলা হয়।

নীচের সারণিতে একক যোজ্যতাবিশিষ্ট ধাতু সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের সঙ্গেও বিভিন্ন মূলক যুক্ত হয়েছে এমন কয়েকটি যৌগের সংকেত ও তাদের মধ্যে উপস্থিত মূলকের সংকেত দেওয়া হলো। সংকেতে সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের পরমাণুর সংখ্যা থেকে মূলকগুলোর যোজ্যতা লেখো:

| যৌগের সংকেত | তার মধ্যে উপস্থিত অ্যানায়নের নাম ও সংকেত | অ্যানায়নের যোজ্যতা |
|---|---|---|
| $Na_2S$ | সালফাইড ($S^{2-}$) | 2 |
| $NaHCO_3$ | বাইকার্বনেট ($HCO_3^-$) | ............ |
| $NaCN$ | সায়ানাইড ($CN^-$) | ............ |
| $NaOH$ | হাইড্রক্সাইড ($OH^-$) | ............ |
| $NaF$ | ফ্লুওরাইড ($F^-$) | ............ |
| $NaBr$ | ব্রোমাইড ($Br^-$) | ............ |
| $NaNO_2$ | নাইট্রাইট ($NO_2^-$) | ............ |
| $Na_2SO_3$ | সালফাইট ($SO_3^{2-}$) | ............ |
| $KMnO_4$ | পারম্যাঙ্গানেট ($MnO_4^-$) | ............ |
| $K_2Cr_2O_7$ | ডাইক্রোমেট ($Cr_2O_7^{2-}$) | ............ |
| $NaAlO_2$ | অ্যালুমিনেট ($AlO_2^-$) | ............ |
| $Na_2ZnO_2$ | জিঙ্কেট ($ZnO_2^{2-}$) | ............ |
| $NaHSO_4$ | বাইসালফেট ($HSO_4^-$) | ............ |

ষষ্ঠ শ্রেণিতে হাইড্রোজেনের যোজ্যতাকে 1 ধরে হাইড্রোজেন যুক্ত বিভিন্ন যৌগ থেকে তোমরা জেনেছ যে অক্সিজেনের যোজ্যতা 2, ক্লোরিনের যোজ্যতা 1।

এবার আমরা ক্লোরিনের বিভিন্ন যৌগ থেকে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুদের যোজ্যতা নির্ণয় করব।

নীচের সারণিতে বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে যুক্ত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যাই হলো ওই মৌলের যোজ্যতা।

| যৌগের নাম | সংকেত | যৌগে ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত ধাতু | যৌগে ধাতুর পরমাণু পিছু ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা | ধাতুর যোজ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| সোডিয়াম ক্লোরাইড | $NaCl$ | Na | .......... | .......... |
| পটাশিয়াম ক্লোরাইড | $KCl$ | K | .......... | .......... |
| ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড | $CaCl_2$ | Ca | 2 | 2 |
| ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড | $MgCl_2$ | Mg | .......... | .......... |
| ফেরাস ক্লোরাইড | $FeCl_2$ | Fe | 2 | .......... |
| ফেরিক ক্লোরাইড | $FeCl_3$ | Fe | 3 | 3 |
| অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড | $AlCl_3$ | Al | .......... | .......... |
| জিঙ্ক ক্লোরাইড | $ZnCl_2$ | Zn | .......... | .......... |
| কিউপ্রাস ক্লোরাইড | $CuCl$ | Cu | 1 | .......... |
| কিউপ্রিক ক্লোরাইড | $CuCl_2$ | Cu | 2 | .......... |
| সিলভার ক্লোরাইড | $AgCl$ | Ag | .......... | .......... |
| লেড ক্লোরাইড | $PbCl_2$ | Pb | .......... | .......... |

ওপরের সারণির যৌগগুলোর সংকেত লক্ষ করলে তোমরা দেখবে আয়রন, কপার প্রভৃতি মৌলের একাধিক যোজ্যতা রয়েছে। এইসব মৌলগুলো যোজ্যতা পরিবর্তন করে একই মৌলের বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন যৌগ তৈরি করতে পারে। এইরকম যোজ্যতাকে মৌলের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা বলে। সারণিটি ভালো করে লক্ষ করে দেখবে যে সব যৌগে মৌলের যোজ্যতা কম সেই যৌগে তাদের নামের শেষে 'আস' যুক্ত হয়েছে আর যে যৌগে ওই মৌলেরই যোজ্যতা অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের নামের শেষে 'ইক' যুক্ত হয়েছে। যেমন ধরো ফেরাস ও ফেরিক যৌগে আয়রনের যোজ্যতা যথাক্রমে 2 ও 3।

## সংকেত লেখার কৌশল

বিভিন্ন মৌল কিংবা মূলকের যোজ্যতাকে ব্যবহার করে কীভাবে যৌগের সংকেত লেখা যায় তা দেখা যাক। ধরা যাক, A ও B দুটি মৌল বা মূলক যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। A মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা m এবং B মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা n হলে A এবং B দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত হবে $A_nB_m$। A মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যা (m)কে B মৌলের বা মূলকের ডানদিকে একটু নীচে এবং B মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যা (n)-কে A মৌলের বা মূলকের ডানদিকে লিখে প্রকাশ করলে সেটি হবে A ও B মৌল বা মূলক দ্বারা তৈরি যৌগের সংকেত।

যেমন: (i) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত লিখতে হবে। Al-এর যোজ্যতা 3 ও O-এর যোজ্যতা 2। সংকেত তৈরির সময় চার্জের + বা – লেখা হয়না।

মৌলের চিহ্ন যৌগের মধ্যে তার চার্জ

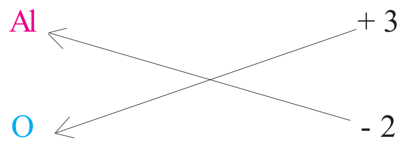


তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত এইরকমভাবে লেখা হলো: $Al_2O_3$।

(ii) অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত লেখার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো।

$NH_4^+$ মূলকের যোজ্যতা 1 ও $SO_4^{2-}$ মূলকের যোজ্যতা 2।

মূলকের সংকেত চার্জ

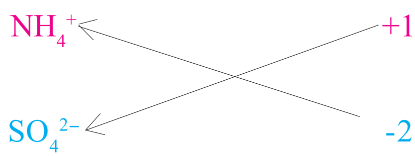


অতএব অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত $(NH_4)_2SO_4$।

(iii) মিথেনের সংকেত লেখার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো:

কার্বনের (C) যোজ্যতা 4 এবং হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1।

মৌলের চিহ্ন যৌগের মধ্যে তার যোজ্যতা

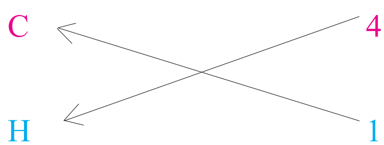


তাহলে মিথেনের সংকেত $C_1H_4$। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার C-এর নীচে 1 লেখার দরকার হয় না। তাই মিথেনের সংকেত $CH_4$।

(iv) হাইড্রোজেন সালফাইডের সংকেত লেখার পদ্ধতি:

হাইড্রোজেন (H) যোজ্যতা 1 এবং সালফারের যোজ্যতা 2।

মৌলের চিহ্ন যৌগের মধ্যে তার যোজ্যতা

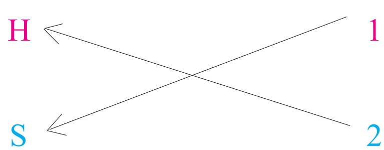


অতএব হাইড্রোজেন সালফাইডের সংকেত $H_2S$।

নীচে কতকগুলো মৌলের চিহ্ন ও যোজ্যতা দেওয়া আছে। আগের পৃষ্ঠার পদ্ধতিকে ব্যবহার করে যৌগগুলোর সংকেত লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

| যৌগের নাম | যৌগে উপস্থিত একটা মৌলের চিহ্ন | ওই মৌলের যোজ্যতা | যৌগে উপস্থিত অন্য মৌলের চিহ্ন | ওই মৌলের যোজ্যতা | যৌগের সংকেত |
|---|---|---|---|---|---|
| কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড | C | 4 | Cl | 1 | |
| ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড | P | 5 | Cl | 1 | |
| অ্যামোনিয়া | N | 3 | H | 1 | |
| সালফার টেট্রা ফ্লুওরাইড | S | 4 | F | 1 | |

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো এবং মৌল ও মূলকের যোজ্যতা ব্যবহার করে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

| যৌগের নাম | যৌগে উপস্থিত ধাতব আয়ন | যৌগে উপস্থিত ধাতব মৌলের যোজ্যতা | যৌগে উপস্থিত অ্যানায়ন বা মূলক | অ্যানায়ন বা মূলকের যোজ্যতা | যৌগের সংকেত |
|---|---|---|---|---|---|
| সোডিয়াম ফ্লুওরাইড | $Na^+$ | 1 | $F^-$ | 1 | .......... |
| ................ | $K^+$ | 1 | $Br^-$ | 1 | .......... |
| লেড ক্লোরাইড | $Pb^{2+}$ | 2 | $Cl^-$ | 1 | .......... |
| অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড | $Al^{3+}$ | 3 | $OH^-$ | 1 | .......... |
| ................ | $Na^+$ | .......... | $HCO_3^-$ | 1 | .......... |
| ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট | $Ca^{2+}$ | 2 | $HCO_3^-$ | ... | .......... |
| জিঙ্ক নাইট্রেট | $Zn^{2+}$ | .......... | $NO_3^-$ | ... | .......... |
| সোডিয়াম ফসফেট | $Na^+$ | 1 | $PO_4^{3-}$ | 3 | .......... |

এই উপায়ে জিঙ্ক অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড, জিঙ্ক সালফাইড বা ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সংকেত লিখবে কী করে?

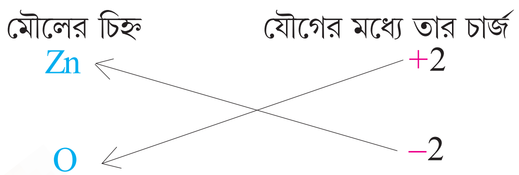


এইভাবে জিঙ্ক অক্সাইডের সংকেত হবার কথা $Zn_2O_2$ কিন্তু ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন উভয়ের পাশেই 2 থাকায় তা বাদ দিয়ে যৌগের সরলীকৃত সংকেত ZnO রূপে লেখা হয়। এই উপায়ে বাকি তিনটে যৌগের সংকেত লেখো।

এবার একটা অন্য পদ্ধতি লক্ষ করো যা থেকেও তুমি যৌগের সংকেত নিজেই লিখতে পারবে। এটা একটা খেলার মতো। খেলার নিয়ম হলো এমন সংখ্যার ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন নিতে হবে যাতে তাদের থেকে তৈরি যৌগের মোট চার্জ শূন্য হয়। এর মানে হলো তুমি যতগুলো ক্যাটায়ন নেবে তাদের মোট পজিটিভ চার্জ অ্যানায়নদের মোট নেগেটিভ চার্জের সমান হতে হবে।

এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

| যৌগের নাম | যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন | যৌগে উপস্থিত অ্যানায়ন | মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই | মোট চার্জ শূন্য হলো কীভাবে | যৌগের সংকেত |
|---|---|---|---|---|---|
| সোডিয়াম ক্লোরাইড | $Na^+$ | $Cl^-$ | প্রত্যেক $Na^+$-এর 1টি (+) চার্জের জন্য 1টি (-) চার্জের দরকার | +1-1=0 | NaCl |
| সোডিয়াম সালফেট | $Na^+$ | $SO_4^{2-}$ | $SO_4^{2-}$-এর চার্জ যেহেতু -2 তাই দুটি $Na^+$ ক্যাটায়ন দরকার | +2-2=0 | $Na_2SO_4$ |
| ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড | $Mg^{2+}$ | $Cl^-$ | প্রত্যেক $Mg^{2+}$-এর জন্য 2টি $Cl^-$ দরকার | ............ | ............ |
| ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড | $Ca^{2+}$ | $Cl^-$ | ............ | ............ | ............ |
| জিঙ্ক অক্সাইড | $Zn^{2+}$ | $O^{2-}$ | ............ | ............ | ZnO |
| অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | $Al^{3+}$ | $O^{2-}$ | 2টি $Al^{3+}$-এর মোট চার্জ যেহেতু +6 তাই 3টি $O^{2-}$-এর মোট চার্জ – 6 প্রয়োজন | 2(+3)+3(-2)=0 | $Al_2O_3$ |
| ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড | $Mg^{2+}$ | $O^{2-}$ | ............. | ............. | ............. |
| ফেরিক অক্সাইড | $Fe^{3+}$ | $O^{2-}$ | ............. | ............. | $Fe_2O_3$ |
| সোডিয়াম সালফাইড | $Na^+$ | $S^{2-}$ | ............. | ............. | $Na_2S$ |
| পটাশিয়াম ফ্লুওরাইড | $K^+$ | $F^-$ | ............ | ............. | ........ |

## রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ

**করে দেখো 1:** একটা গ্লাসে জল নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা মিউরিয়েটিক অ্যাসিড (বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য এই অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়) মেশাও। তার মধ্যে এক চিমটে কাপড় কাচার সোডা যোগ করো। (শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতিতে কাজ করো)

2: ওপরের মতো একইরকম অ্যাসিড দ্রবণ তৈরি করে তার মধ্যে কয়েকটা নতুন পেরেক (দস্তার প্রলেপ দেওয়া) ফেলে দাও। (এক্ষেত্রে পেরেকের পরিবর্তে জিঙ্কের টুকরো ব্যবহার করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে।)

3 : একটা গ্লাসে জল নিয়ে ছোটো এক টুকরো পাথুরে চুন তার মধ্যে সাবধানে ফেলে দাও। কী দেখতে পেলে নীচে লেখো।

| কোন ক্ষেত্রে | কী করলে | কী দেখলে |
|---|---|---|
| করে দেখো 1 | | |
| করে দেখো 2 | | |
| করে দেখো 3 | | |

কেন এমন হলো বলো তো?

প্রথম ক্ষেত্রে: কাপড় কাচার সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট, $Na_2CO_3$), লঘু মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, $HCl$) সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করেছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে: লোহার পেরেকের ওপর প্রলেপ দেওয়া দস্তার সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (মিউরিয়েটিক অ্যাসিড) বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করেছে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে: পাথুরে চুন জলের সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ নতুন একটা পদার্থে পরিণত হলো। এই নতুন পদার্থটার ধর্ম, চুনের ধর্ম থেকে একেবারেই আলাদা। লক্ষ করো জল গরম হয়ে গেছে।

এরকম ঘটনাকেই আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন বা রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে থাকি। পাথুরে চুন জলে দিলে দেখতে পাবে গ্লাসটা বেশ কিছুটা গরম হয়ে গেছে। অর্থাৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন হয়েছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ যেমন উৎপন্ন হতে পারে তেমনি এমন রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায় যেখানে বিক্রিয়া মিশ্রণের তাপমাত্রা কমে গেছে। অর্থাৎ, তাপের শোষণ ঘটেছে। পাথুরে চুন জলে দিলে একটা সাদা রঙের পদার্থ উৎপন্ন হয়। একে কলিচুন বলা হয়। এর রাসায়নিক নাম ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড।

এই বিক্রিয়ায় পাথুরে চুন ও জল অংশ নিয়েছে। তাই এদের বিক্রিয়ক বলে। আর বিক্রিয়ার ফলে কলিচুন উৎপন্ন হয়েছে। তাই একে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলা হয়।

তোমরা নীচের সারণিতে পাথুরে চুন বা ক্যালশিয়াম অক্সাইড, জল ও কলিচুনের সংকেত লেখো।

| কেমন পদার্থ | যৌগের নাম | যৌগের সংকেত |
|---|---|---|
| বিক্রিয়ক | পাথুরে চুন বা ক্যালশিয়াম অক্সাইড | |
| | জল | |
| বিক্রিয়াজাত | কলিচুন বা ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড | |

পাথুরে চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কলিচুন উৎপন্ন হয়। লক্ষ করে দেখো কতটা জায়গা লাগল কথাটা বোঝাতে। আমরা যদি বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়াটাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করি, তখন তাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। রাসায়নিক সমীকরণ লেখার সময় একের বেশি বিক্রিয়ক পদার্থ থাকলে তাদের সংকেতের মাঝখানে (+) চিহ্ন দিয়ে পরপর লেখা হয়। আবার একের বেশি বিক্রিয়াজাত পদার্থ থাকলে তাদের সংকেতের মাঝেও (+) চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়। এতে বোঝা যায় যে বিক্রিয়কগুলো একসঙ্গে বিক্রিয়া করেছে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোও একসঙ্গে তৈরি হয়েছে। তাহলে পাথুরে চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হবে:

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

আবার চুনাপাথর (ক্যালশিয়াম কার্বনেট)-কে তাপ দিলে পোড়াচুন (ক্যালশিয়াম অক্সাইড) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় : $CaCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO + CO_2$

এই বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর নাম ও সংকেত নীচের সারণিতে লেখো। তারপর সমীকরণের সাহায্যে বিক্রিয়াকে প্রকাশ করো।

| বিক্রিয়ক পদার্থের নাম | বিক্রিয়কের সংকেত | বিক্রিয়াজাত পদার্থের নাম | বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত |
|---|---|---|---|
| | | | |

বিক্রিয়ার সমীকরণ হবে: ........................................................

## সমীকরণের সমতাবিধান করা

হাইড্রোজেন ($H_2$) ও অক্সিজেন ($O_2$) মিলিত হয়ে জল ($H_2O$) উৎপন্ন করে।
বিক্রিয়াটিকে সমীকরণের আকারে কীভাবে লেখা যাবে?

$$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$$

লক্ষ করে দেখো সমীকরণের বাঁ ও ডান দুই দিকেই H পরমাণু সংখ্যা দুটি করে। কিন্তু O পরমাণুর সংখ্যা বাঁ দিকে দুটি হলেও ডানদিকে O পরমাণুর সংখ্যা একটি। অর্থাৎ O পরমাণুর সংখ্যা দু-দিকে আলাদা।

কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার সময় একটা বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত দিয়ে বিক্রিয়ার সমীকরণ প্রকাশ করার পর প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমীকরণের বাম ও ডান দিকে সমান হলো কিনা তা দেখতে হবে। যদি কখনও কোনো মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান না হয়, তাহলে কী করতে হবে?

সমীকরণের মধ্যে লেখা বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেতের আগে উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে দু-দিকে প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে হবে। এই পদ্ধতিকেই বলে সমীকরণের সমতাবিধান (Balance) করা।

তাহলে জল তৈরির বিক্রিয়ার সমীকরণকে সমতাবিধান করলে কী পাওয়া যাবে?

সমতাবিধান করে সমীকরণ হবে —

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

(1) মারকিউরিক অক্সাইডকে (HgO) উত্তপ্ত করলে পারদ (Hg) এবং অক্সিজেন ($O_2$) উৎপন্ন হয়।

$$HgO \rightarrow Hg + O_2$$

এই বিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে, ডান দিকে অক্সিজেন পরমাণু আছে 2টি। তাহলে বাঁদিকে যদি 2HgO লিখি? তখন আবার বাঁ দিকে Hg পরমাণুর সংখ্যা 2 হয়ে যাবে। তাই ডান দিকের Hg-এর সামনে 2 লিখতে হবে।

$2HgO = 2Hg + O_2$, এটা সমতাযুক্ত সমীকরণ। কোনো রাসায়নিক সমীকরণে মৌল বা যৌগের সংকেতের আগে 2 বা 3 লেখা হলে তার মানে কী দাঁড়ায়? তার মানে হলো সেই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা বা যৌগে উপস্থিত সব মৌলের পরমাণু সংখ্যাই 2 বা 3 গুণ হয়ে গেল।

(2) আবার নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গঠন করে। ঘটনাটিকে বিক্রিয়ক মৌল ও বিক্রিয়াজাত যৌগের সংকেতের সাহায্যে লিখলে নীচের মতো করে লেখা যায়।

$$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$$

ভালো করে লক্ষ করে দেখো, বাঁ দিকে দুটি করে N ও H পরমাণু আর ডান দিকে একটি N পরমাণু ও 3টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। আমরা জানি, 2 ও 3-এর ল.সা.গু. হলো 6। তাহলে বাঁ দিকে $H_2$-এর আগে 3 আর ডান দিকে $NH_3$-এর আগে 2 লিখে দেখো তো।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $N_2$ | + | $3H_2$ | = | $2NH_3$ |
| 2টি N পরমাণু | | $3\times2 = 6$ টি H পরমাণু | | 2টি N পরমাণু + 6 টি H পরমাণু |

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা জায়গাগুলোয় ঠিকমতো সংখ্যা বসিয়ে রাসায়নিক সমীকরণগুলোর সমতাবিধান করো।

| | বিক্রিয়ক | | | | বিক্রিয়াজাত পদার্থ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | $C$ | + | $O_2$ | = | .....$CO$ | | |
| (ii) | $Fe_2O_3$ | + | $C$ | = | .....$Fe$ | + .....$CO$ | |
| (iii) | $Na_2CO_3$ | + | .....$HCl$ | = | .....$NaCl$ | + $CO_2$ | + $H_2O$ |
| (iv) | $2Pb(NO_3)_2$ | | | = | .....$PbO$ | + .....$NO_2$ | + $O_2$ |
| (v) | .....$AgNO_3$ | + | $H_2S$ | = | $Ag_2S$ | + .....$HNO_3$ | |
| (vi) | $P_4$ | + | .....$I_2$ | = | .....$PI_3$ | | |
| (vii) | $CH_4$ | + | .....$O_2$ | = | $CO_2$ | + ..... $H_2O$ | |
| (viii) | .....$KClO_3$ | | | = | .....$KCl$ | + .....$O_2$ | |
| (ix) | .....$KI$ | + | $Cl_2$ | = | .....$KCl$ | + $I_2$ | |
| (x) | .....$NaOH$ | + | $H_2SO_4$ | = | $Na_2SO_4$ | + ...$H_2O$ | |

## রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা ওপরে দেখতে পেলাম তারা সবই কি একই ধরনের?

সব বিক্রিয়া যে একই ধরনের নয়, তা বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো লক্ষ করলে কিছুটা বুঝতে পারবে। কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক পদার্থ একটাই। আবার কোনো ক্ষেত্রে একাধিক। বিক্রিয়াজাত পদার্থের ক্ষেত্রেও একইরকম ব্যাপার। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়া নানাধরনের।

তোমরা দেখেছ যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে জল উৎপন্ন করে।

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়।

$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$$

এই দুটো বিক্রিয়াতেই বিক্রিয়ক পদার্থগুলো মৌলিক পদার্থ। আর বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো হলো ওই সমস্ত মৌলের সংযোগে উৎপন্ন যৌগ। তাই এরকম বিক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়া বলে।

পরের পৃষ্ঠায় কিছু প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিক্রিয়াজাত যৌগের নাম ও সংকেত এবং বিক্রিয়াগুলোর সমিত সমীকরণ লেখো। ( প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।)

| বিক্রিয়ক মৌল | বিক্রিয়াজাত যৌগের নাম ও সংকেত | সমিত সমীকরণ |
|---|---|---|
| ম্যাগনেশিয়াম ও অক্সিজেন | | |
| হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন | | |

কোনো কোনো বিক্রিয়ায় একটা যৌগ ভেঙে গিয়ে একাধিক পদার্থ (মৌল বা যৌগ) উৎপন্ন হয়।

চুনাপাথর ($CaCO_3$)-কে উত্তপ্ত করলে পোড়াচুন ($CaO$) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) উৎপন্ন হয়। এটা তোমরা আগেই জেনেছ। আবার সামান্য অ্যাসিড মেশানো জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে জল ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এই দুটো বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো :

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2 \qquad\qquad 2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$$

ওপরের দুটো বিক্রিয়াতেই আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

তাপ বা তড়িতের প্রভাবে একটা যৌগ ভেঙে একাধিক পদার্থে পরিণত হয়েছে। এরকম বিক্রিয়াকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোর প্রভাবেও বিয়োজন বিক্রিয়া ঘটতে পারে।

নীচের কয়েকটা বিয়োজন বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও কোনো ক্ষেত্রে একটা বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত দেওয়া আছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত লেখো। [ প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও]

| বিক্রিয়ক পদার্থ | | বিক্রিয়াজাত পদার্থ |
|---|---|---|
| $2KClO_3$ | → | .............. + $3O_2$ |
| $2HgO$ | → | .............. + .............. |
| $2H_2O_2$ | → | .............. + $O_2$ |

**করে দেখো:** একটা পাত্রে সামান্য জল ও তুঁতে মিশিয়ে তুঁতের দ্রবণ তৈরি করো। এই দ্রবণের মধ্যে একটা পরিষ্কার লোহার ছুরি ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দাও। কী করলে ও কী দেখতে পেলে তা নীচে লেখো।

| কী করলে | কী দেখলে |
|---|---|
| | |

এখানে কী ঘটল?

— তুঁতের (কপার সালফেট, $CuSO_4$) দ্রবণ থেকে কিছুটা তামা এসে লোহার ছুরির গায়ে লালচে বাদামি আস্তরণ তৈরি করল। তাহলে তুঁতের দ্রবণ থেকে যখন তামা এভাবে জমা হলো, তার সঙ্গে সঙ্গে আর কী হলো?

— লোহার ছুরি থেকে কিছুটা লোহা ওই দ্রবণের মধ্যে গুলে গেল; যদিও তা পরিমাণে এত কম যে চোখে দেখে বোঝা যাবে না। এই বিক্রিয়াটাকে সমীকরণের আকারে লিখলে কী লেখা যাবে? আমরা লিখব:

$$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$$

আবার কিউপ্রিক ক্লোরাইড দ্রবণে দস্তা (জিঙ্ক) যোগ করলে লালচে বাদামি রং-এর তামা (কপার) থিতিয়ে পড়বে।

$$Zn + CuCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Cu$$

এরকম বিক্রিয়া, যেখানে একটা মৌল অন্য মৌলের যৌগ থেকে তাকে সরিয়ে সেই জায়গা নেয়, তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে।

**করে দেখো:** একটা পাত্রে কিছু জলের মধ্যে খাবার লবণ মিশিয়ে খাবার লবণের খুব পাতলা একটা দ্রবণ তৈরি করো। ওই দ্রবণের মধ্যে কয়েক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মেশাও। কী করলে ও কী দেখলে তা লেখো।

| কী করলে | কী দেখলে |
|---|---|
| | |

এখানে কী ঘটল?

— সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) ও সিলভার নাইট্রেট ( $AgNO_3$) বিক্রিয়া করে সাদা রঙের যে যৌগটা থিতিয়ে পড়ছে তা হলো সিলভার ক্লোরাইড ($AgCl$)।

$$NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$$

— ওপরের সমীকরণটা লক্ষ করো। বিক্রিয়াটাকে যদি এভাবে দেখা হয়:

| কোন যৌগের | কোন আয়ন (বা মূলক) আলাদা হয়েছে | কোন আয়ন (বা মূলক) যুক্ত হয়েছে |
|---|---|---|
| সোডিয়াম ক্লোরাইড | $Cl^-$ | $NO_3^-$ |
| সিলভার নাইট্রেট | $NO_3^-$ | $Cl^-$ |

তাহলে এই বিক্রিয়াতে দুটো বিক্রিয়ক পদার্থের মধ্যে উপস্থিত আয়ন (বা মূলক) ($Cl^-$ ও $NO_3^-$) বিনিময় ঘটে বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো উৎপন্ন হয়েছে। তাই এটা একটা বিনিময় বিক্রিয়া।

আবার ফেরাস সালফেট দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলে সাদা রং-এর বেরিয়াম সালফেট থিতিয়ে পড়ে। আর ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো:

$$FeSO_4 + BaCl_2 \rightarrow FeCl_2 + BaSO_4$$

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কীভাবে এই বিক্রিয়াটিকে আগের বিক্রিয়াটির মতোই ব্যাখ্যা করা যায় তা নীচের সারণিতে লেখো।

| কোন যৌগের | কোন আয়ন (বা মূলক) আলাদা হয়েছে | কোন আয়ন (বা মূলক) যুক্ত হয়েছে |
|---|---|---|
| | | |

নীচের সারণিতে দেওয়া বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণ দেখে বিক্রিয়াগুলো কেমন ধরনের তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

| বিক্রিয়ার সমীকরণ | কেমন ধরনের বিক্রিয়া |
|---|---|
| $C + O_2 \rightarrow CO_2$ | |
| $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ | |
| $CaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2NaCl$ | |
| $2Ag_2O \xrightarrow{\text{তাপ}} 4Ag + O_2$ | |
| $PCl_5 \rightarrow PCl_3 + Cl_2$ | |
| $Fe + S \xrightarrow{\text{তাপ}} FeS$ | |
| $2AgBr \xrightarrow{\text{সূর্যালোক}} 2Ag + Br_2$ | |
| $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$ | |
| $2FeSO_4 \xrightarrow{\text{তাপ}} Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$ | |
| $2Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2PbO + 4NO_2 + O_2$ | |
| $Na_2CO_3 + Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbCO_3 + 2NaNO_3$ | |
| $HgCl_2 + Cu \longrightarrow CuCl_2 + Hg$ | |
| $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$ | |

# 4 পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা

## জীবদেহ গঠনে অজৈব ও জৈব পদার্থের ভূমিকা

__________ __________ __________ __________ __________ __________

ওপরের ফাঁকা জায়গায় তোমার জানা ছটি মৌলের নাম লেখো যাদের চারটি হলো অধাতু ও দুটি হলো ধাতু। প্রায় 92টি মৌল দিয়েই পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিস তৈরি হয়েছে। জীবদেহে কিন্তু 92টি মৌলের প্রত্যেকটি পাওয়া যায় না। মাত্র 16টি মৌল নানান যৌগের আকারে জীবদেহে থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠ আর মানবদেহের মধ্যে উপাদানে কী তফাত তা বুঝতে নীচের তালিকাটি দেখো। এখানে প্রতি 100 গ্রাম ওজনে কোন কোন প্রধান মৌল কত গ্রাম করে আছে তা দেখানো হয়েছে।

| মানুষের দেহে মৌলের ওজনানুপাতিক শতাংশ | | পৃথিবীর পৃষ্ঠে মৌলদের ওজনানুপাতিক শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| অক্সিজেন | 61.42 | অক্সিজেন | 46.6 |
| কার্বন | 22.85 | কার্বন | < 1 |
| নাইট্রোজেন | 2.57 | অ্যালুমিনিয়াম | 8.1 |
| হাইড্রোজেন | 9.99 | আয়রন | 5 |
| ক্যালশিয়াম | 1.43 | ক্যালশিয়াম | 3.6 |
| ফসফরাস | 1.11 | সিলিকন | 27.7 |
| সোডিয়াম | 0.14 | সোডিয়াম | 2.8 |
| পটাশিয়াম | 0.14 | পটাশিয়াম | 2.6 |

তালিকা থেকে তুমি এমন তিনটি অধাতব মৌলের নাম লেখো যাদের পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের চেয়ে মানবদেহে বেশি।

(1) ...................., (2) ...................., (3) ....................।

আরো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মানবদেহের ওজনের প্রায় 97 শতাংশ হলো চারটি মৌলের মিলিত ভর। এরা কী কী বলতে পারো? (1) ...................., (2) ...................., (3) ...................., (4) ....................।

শুধু মানবদেহ নয়; ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, সপুষ্পক উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রাণীদের দেহের উপাদান নিয়ে পরীক্ষা করলে সেখানেও এই চারটি মৌলের (C, H, O এবং N) প্রাধান্য দেখা যায়। এই চারটি মৌল দিয়ে নানা ধরনের জৈব যৌগ তৈরি হয় যা পৃথিবীপৃষ্ঠে পাওয়া যায় না। সেখানে আবার নানা অজৈব যৌগ (ধাতুর খনিজ পদার্থ) পাওয়া যায়।

একটা সবুজ পাতাওয়ালা গাছের কথাই ধরো — সে বাতাস থেকে নেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাটি থেকে নেয় জল আর কিছু খনিজ লবণ। এসবই অজৈব যৌগ। এসব যৌগ আর সূর্যের আলোর শক্তি কাজে লাগিয়ে গাছ তৈরি করে গ্লুকোজ। এটা একধরনের জৈব যৌগ যা পৃথিবীপৃষ্ঠে যৌগদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই যে নতুন যৌগ তৈরি করার ক্ষমতা — এ হলো জীবের ধর্ম। শুধু গ্লুকোজ নয়, নানাভাবে গাছ আরো অনেক জৈব যৌগ তৈরি করতে পারে। তার অনেকগুলোই আমাদের ওষুধ। কোনোটা সুগন্ধি, কোনোটা পোকা তাড়ায়। আবার কোনোটা বা রং। এই নানারকমের জৈব যৌগ তৈরির ক্ষমতাই জীব আর জড়জগতের তফাত করে দিয়েছে।

## জীবদেহের নানা যৌগ

জীবদেহ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ হলো জল। মানুষের দেহে এই জলের পরিমাণ প্রায় 70 শতাংশ। এই জলের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ কোশের মধ্যে থাকে। বাকি জল কোশের বাইরে আর রক্তে থাকে।

স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের দেহে প্রায় 10 শতাংশ জল বেশি থাকে।
ওজনের শতাংশের বিচারে বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের দেহে জলের পরিমাণ বেশি থাকে।
ওজনের শতাংশের বিচারে রোগা লোকদের দেহে মোটা লোকদের তুলনায় জল বেশি থাকে।

জীবদেহে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকলে জলের শতাংশ পরিমাণ কমে যায়।

প্রাণরক্ষা করার জন্য অক্সিজেনের পরই গুরুত্বপূর্ণ হলো জল। কয়েকদিন জলপান না করলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও প্রোটিন হজম হওয়ার পর তাদের সারাংশ জলের মাধ্যমেই সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। আবার দেহে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ জলের মাধ্যমেই দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে জল দ্রাবকের ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও জল দেহের নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (খাদ্যসংশ্লেষ, পরিপাক, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করে।

শামুক, ঝিনুকদের দেহের বাইরে শক্ত খোলস থাকে। এটি ক্যালশিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। জলে দ্রবীভূত ক্যালশিয়াম আয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগিয়ে শামুক, ঝিনুকরা এই যৌগটি তৈরি করে। আবার জলের মধ্যে গুলে যাওয়া অক্সিজেন ব্যবহার করে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বেঁচে থাকে। জলের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো চলাচল করতে পারে বলে জলজ উদ্ভিদরা খাদ্য তৈরি করতে পারে। এরকম তিনটি উদ্ভিদের নাম লেখো।

(1) ....................., (2) ....................., (3) .....................।

জীবদেহ গঠনে অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নানা ধাতব আয়ন।

**টুকরো কথা**

**এই কথাগুলোর মানে কী? কথাগুলো কী সত্যি?**

- "ছোটো মাছ খাওয়া ভালো, ওতে ক্যালশিয়াম আছে"।
- "ডাক্তারবাবু মা-কে ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট খেতে দিয়েছেন।"
- "মেটে খেলে শরীর আয়রন পায়।"

আমাদের দেহের কাজে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, আয়রন, কপার, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, আর, কোবাল্ট খুব প্রয়োজনীয় ধাতু। এদের কোনোটা ছাড়াই আমাদের চলবে না। এখানে আমরা মানবদেহের অতি প্রয়োজনীয় চারটে ধাতুর কথা জানব। এই ধাতুগুলো হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্যালশিয়াম আর আয়রন।

**প্রথমেই যে কথাটা আমাদের বুঝতে হবে তাহল শরীরে আসলে এইসব ধাতুদের নানান যৌগ থাকে। শরীর সরাসরি ধাতুগুলোকে কাজে লাগাতে পারে না।** তুমি যখন ছোটো মাছ ভেজে খাচ্ছ তখন কিন্তু শরীরে ধাতব ক্যালশিয়াম ঢুকছে না, ঢুকছে মাছের হাড়ের গুঁড়ো। হাড়ের গুঁড়োয় আছে ক্যালশিয়ামের ফসফেট যৌগ। একে শরীর কাজে লাগাতে পারবে। আবার ক্যালশিয়াম ট্যাবলেটে থাকে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) আর কিছু জৈব যৌগ। মেটে বা লিভারে আছে আয়রনের যৌগ। গর্ভবতী মহিলাকে যে আয়রন ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু লোহার গুঁড়ো নেই; আছে লোহার বিশেষ কিছু যৌগ যা শরীর কাজে লাগাতে পারবে।

**আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতব আয়নগুলো যৌগরূপে খাদ্য ও লবণের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কখনও শরীরে এদের ঘাটতি দেখা দিলে বিশেষ বিশেষ ওষুধের মাধ্যমেও এদের খেতে হয়।**

**বিভিন্ন ধাতুর আয়ন কী কাজে লাগে :**

**আয়রন (লোহা) ঃ** মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত তৈরি করতে আয়রন খুব প্রয়োজন। রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন ফেরাস আয়ন ($Fe^{2+}$) ছাড়া কাজই করতে পারে না।

**ক্যালশিয়াম ঃ** আমাদের দেহে হাড়ের কঙ্কাল আছে বলেই আমরা হাঁটা-চলা, দৌড়োনো,ঝুঁকে-পড়া এসব করতে পারি। হাড়ের প্রধান উপাদান হলো ক্যালশিয়ামের ফসফেট যৌগ। এছাড়াও, কোশের অনেক কাজ ক্যালশিয়াম আয়ন ($Ca^{2+}$) ছাড়া চলবে না।

**সোডিয়াম আর পটাশিয়াম ঃ** তোমায় পিঁপড়ে কামড়ালে বা সুড়সুড়ি দিলে সেই অনুভূতি তৎক্ষণাৎ সরু সুতোর মতো স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সুষুন্না কাণ্ডে পৌঁছে যায়। এই যে স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সংকেত যাওয়া-আসা এসব ঠিকঠাকভাবে হতে হবে। শরীরে ঠিক ঠিক মাত্রায় সোডিয়াম আয়ন ($Na^{+}$) আর পটাশিয়াম আয়ন ($K^{+}$) না থাকলে সে কাজ হবে না। তখন মানুষ হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতে পারে, অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে।

**জৈব যৌগ ঃ** প্রাণ সৃষ্টির সময় শুধু যে জল বা বিভিন্ন ধাতব আয়ন লেগেছিল তা নয়। নানাধরনের জৈব যৌগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এরকম চার ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগ হলো — কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

তোমরা শুনেছ যে আমাদের দেহগঠন ও দেহরক্ষায় কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, নানা ধরনের প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির খুব গুরুত্ব আছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব যৌগ গঠনে যেসব মৌলের প্রয়োজন তারাও অপরিহার্য। এসব মৌলরা হলো- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন। আবার প্রোটিন অণু, নিউক্লিক অ্যাসিড ও অন্যান্য ছোটো ছোটো জৈব অণু তৈরিতে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়াও সালফার ও ফসফরাস অংশগ্রহণ করে। জীবদেহে এসব মৌল দিয়ে তৈরি যৌগের প্রাচুর্যের জন্যই জীবদেহ আর ভূত্বকের গঠনে মৌলের পরিমাণের এতটা পার্থক্য দেখা যায়।

তুমি যদি একটা ধানের বীজ পুঁতে দাও, কয়েকদিন পরে কী দেখতে পাবে? ....................।

ধানের বীজ থেকে চারা বেরোনোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে শর্করা থেকে। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলা হয়। লিপিডরা জলে গোলে না। কোশে লিপিড ভেঙে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। আর চামড়ার নীচে এরকম লিপিডের মোটা স্তর থাকলে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরকম দুটো প্রাণীর নাম করো যাদের চামড়ার নীচে পুরু লিপিডের স্তর দেখা যায় — .................. , .........................।

প্রোটিন হলো এমন একটি যৌগ যা ছাড়া প্রাণীদেহ গঠন ও তার বিভিন্ন কাজের কথা ভাবাই যায় না। ইতিমধ্যেই তোমরা মানুষের দেহের কোথায় কোথায় প্রোটিন আছে তার কথা জেনেছ (চুল, নখ, চামড়া, পেশি, রক্ত)। বিশেষ বিশেষ প্রোটিনই আমাদের রোগ জীবাণুর হাত থেকে বাঁচায়। আবার রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন প্রোটিন দেহের সব জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। বিভিন্ন উৎসেচক (এনজাইম) আমাদের দেহের নানান বিক্রিয়া (খাদ্যসংশ্লেষ, খাদ্যের পাচন, জীবাণু মেরে ফেলা, শক্তি উৎপাদন) তাড়াতাড়ি ঘটতে সাহায্য করে।

কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশধররা কেমন দেখতে হয় তা ঠিক করে নিউক্লিক অ্যাসিড। আবার কোন জীবের কেমন আচরণ হবে তাও ঠিক করে দেয় এই নিউক্লিক অ্যাসিড। এরকম তোমার জানা কয়েকটি বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো যা অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীতে দেখা যায় না।

(1) ম্যানগ্রোভ অরণ্যে জন্মানো উদ্ভিদ : ..........................................................................।

(2) রাতের বেলায় শিকার করতে বেরোনো প্রাণী : ...................................................।

(3) শুকনো আর গরম অঞ্চলে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদ : ....................................................।

## সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আম্লিক ও ক্ষারীয় দ্রব্য শনাক্তকরণ

জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যের প্রয়োজন, এটা আমরা জানি। আমরা এটাও জানি যে সবুজ উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। আর বিভিন্ন রূপে সেই খাদ্য চক্রাকারে তৃণভোজী থেকে মাংসাশী প্রাণীতে ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা ভেবে বলো তো উদ্ভিদের কোন কোন অংশ সাধারণত আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি?

| উদ্ভিদ দেহের অংশ | কোন গাছের অংশ |
|---|---|
| মাটির তলার মূল | বিট, গাজর, মুলো |
| মাটির তলার বা উপরের কাণ্ড | |
| ফল | |
| | |

তোমরা যেসব ফল খেয়েছ বা সবজি হিসাবে যে সমস্ত গাছের ফল আমরা খাই তাদের স্বাদ কি একরকম ? নিজেদের আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলাবলি করে লেখো —

| পরিচিত ফলের নাম | তাদের স্বাদ |
|---|---|
| পাতিলেবু | |
| পাকা আম | |
| আনারস | |
| | |
| | |

## অম্লের ধারণা

তাহলে দেখা গেল যে, সব ফলের স্বাদ একরকম নয়— কোনো ফল মিষ্টি, কোনোটা টক মেশানো মিষ্টি স্বাদের, আবার কোনোটা শুধুই টক। তোমরাই তাহলে ভাবো, মিষ্টি ফলের থেকে অন্য ফলগুলো স্বাদে আলাদা হলো কেন? অন্য ফলগুলোয় নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার জন্য তাদের স্বাদ টক।

শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে তিনটে ছোটো কাচের গ্লাসে কিছুটা করে চিনির দ্রবণ, নুনের দ্রবণ ও ভিনিগার দ্রবণ তৈরি করো। দ্রবণ তিনটের স্বাদ নিয়ে তাদের চেনার চেষ্টা করো।

| নমুনা দ্রবণটির স্বাদ | নমুনাটি কী বলে মনে হয় |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

দেখা যাচ্ছে যে ফল ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে যাদের স্বাদ টক। যেমন — টকে যাওয়া দুধ, ভিনিগার, দই।

আমরা এর থেকে কি বুঝতে পারছি যে ওপরের জানা টক স্বাদের জিনিসগুলোর মধ্যে এমন একটা সাধারণ (Common) জিনিস মিশে আছে যেটা ওদের টক স্বাদের জন্য দায়ী? সেই জিনিসটাকেই আমরা **অ্যাসিড** (Acid) বলি।

অ্যাসিড কথাটা কোথা থেকে এসেছে জানো? ল্যাটিন শব্দ **অ্যাসিডাস** থেকে, যার অর্থ **টক বা অম্ল।**

**দলগত কাজ -** চলো আমরা স্কুলের চারপাশে বা বাড়ির চারপাশে কী কী টক স্বাদের ফলের গাছ দেখা যায়, তার একটা তালিকা বানাই :

............. গাছ,............... গাছ,..............গাছ।

আমরা জেনে নিই পরিচিত কিছু জিনিসের মধ্যে কী কী অ্যাসিড আছে (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও) :

| | |
|---|---|
| আপেল | ম্যালিক অ্যাসিড |
| পাতিলেবু | সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক অ্যাসিড |
| কমলালেবু | সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক আসিড |
| তেঁতুল | টারটারিক অ্যাসিড |
| টম্যাটো | অক্সালিক অ্যাসিড |
| চা | .................... |
| দই | .................... |
| ভিনিগার | .................... |
| সোডাওয়াটার | .................... |
| মিউরিয়েটিক অ্যাসিড | .................... |

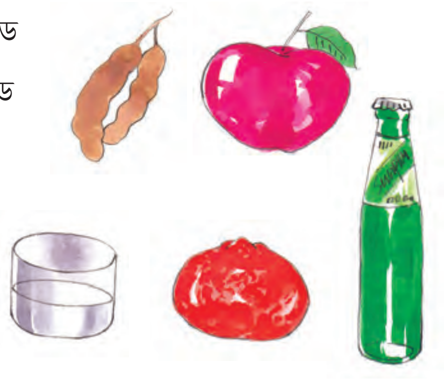

উদ্ভিদ দেহেই যে শুধু অ্যাসিড আছে তা নয়। এমন অনেক অ্যাসিড আছে যা বিভিন্ন প্রাণী বা মানুষের দেহেও পাওয়া যায়। একটা ছোটো লাল পিঁপড়ে কামড়ালে দেখা যায় সেই জায়গাটায় জ্বালা করে। তোমরা লক্ষ করে থাকবে লেবুর রস যেমন সিমেন্টের মেঝেতে দাগ সৃষ্টি করে, তেমনি একটা বড়ো পিঁপড়ে মরে গেলেও তার দেহ থেকে বেরোনো রসও লাল সিমেন্টের মেঝেতে প্রায় একইরকম দাগ তৈরি করে।

— এরকম ঘটনা ঘটে তাদের মধ্যে থাকা অ্যাসিডের জন্য। আগেই আমরা জেনেছি যে জামাকাপড়ের কোনো কোনো দাগ তোলার জন্যও লেবুর রস (যার মধ্যে অ্যাসিড আছে) ব্যবহার করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে অ্যাসিড ব্যবহারের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আমাদের নানা কাজে অ্যাসিড লাগে। এরকম কোনো ক্ষেত্রে অ্যাসিডের ব্যবহার তোমাদের জানা আছে কি? আলোচনা করে লেখো।

| কী জিনিস | কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

একটা ছোটো কাচের গ্লাসে এক চামচ ভিনিগার নিয়ে আধ গ্লাস জলে মেশাও অথবা পাতিলেবুর রস নাও। তার মধ্যে এক চিমটে খাবার সোডা মেশাও। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

—এবার লক্ষ করো কিছু ঘটছে কিনা?

| কী করা হলো | কী দেখা গেল |
|---|---|
| | |

এটা কেন হলো বলো তো? এর কারণ হলো লেবুর রসে বা ভিনিগারে যে অ্যাসিড আছে, সেটা খাবার সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করেছে।

## ক্ষারকের ধারণা

অন্য একটা ছোটো কাচের গ্লাসে পানীয় জলের মধ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তায় ছাত্রছাত্রীরা খাবার সোডার দ্রবণ তৈরি করো। এবার তোমরা আগের নেওয়া ভিনিগার দ্রবণ (বা লেবুর ছেঁকে নেওয়া রস), কিছুটা চুনজল ও এখন তৈরি হওয়া দ্রবণটার স্বাদ নাও। তোমাদের অনুভূতির কথা লেখো।

| কীসের দ্রবণ | তার স্বাদ |
|---|---|
| ভিনিগার দ্রবণ | |
| খাবার সোডার দ্রবণ | |
| চুনের জল | |

তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ যে এই তিনটে দ্রবণ স্বাদে ভিন্ন। তাহলে বোঝা গেল যে দ্রবণ দুটো একইরকম নয়। এদের মধ্যে ভিনিগার যে অ্যাসিড সেটা আমরা আগেই জেনেছি। তাহলে অন্য জিনিসগুলো কী?

তোমার বাড়ির কাছে পানের দোকানে গিয়ে জানার ও দেখার চেষ্টা করো দোকানের কাকু কীভাবে চুন জল তৈরি করেন। লক্ষ করলে দেখতে পাবে বেশ খানিকটা জলের মধ্যে পাথুরে চুন দিলেই কেমনভাবে জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে। একই সঙ্গে কেমন শোঁ-শোঁ করে আওয়াজ হয়। এই চুন জল কিন্তু দোকানের কাকু সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করেন না। বেশ কয়েকদিন রাখার পর তবে তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন।

**খেয়াল রাখো -** তুমিও যখন চুনের জল ব্যবহার করবে তখন অনেক আগে থেকেই জলে চুন মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে তার ওপর থেকে সাবধানে কিছুটা জল ঢেলে নিতে হবে। চুন জল যেন কোনোভাবেই চোখে বা মুখে না পড়ে।

তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে আমড়া বা তেঁতুল গাছের তলায় বীজ থেকে অন্য গাছের চারা জন্মাতে চায় না। তার কারণ কী বলো তো?

— এই গাছগুলোর পাতায় অ্যাসিড থাকে। পাতা চিবোলেও টক স্বাদ পাওয়া যায়। ফলে মাটিতে পড়া পাতা থেকে গাছের নীচের মাটির অম্লত্ব বেড়ে যায়। তখন মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য মাটিতে চুন মেশানো হয়। তোমরা এও জানো যে পুকুরে মাছ চাষ করার সময় জলের অম্লত্ব কমানোর জন্য জলের মধ্যে চুন মেশানো হয়।

এই ধরনের পদার্থ যারা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের আমরা বলি **ক্ষারক (Base)**। যেসমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় তাদের বলা হয় ক্ষার **(Alkali)**। লঘু ক্ষারীয় দ্রবণের স্বাদ কষা ধরনের ও তাদের গাঢ় দ্রবণ স্পর্শ করে দু-আঙুলে ঘষলে পিচ্ছিল মতো অনুভূতি হয়। সব ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সব ক্ষারক ক্ষার নয়। মনে রেখো গাঢ় ক্ষারীয় দ্রবণ চামড়া ও চোখের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক।

চুনের অথবা অন্য কোনো ক্ষারকের ব্যবহার জানা থাকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো:

| জিনিসের নাম | তার ব্যবহার |
|---|---|
| | |
| | |

আমাদের শরীরেও অনেকরকম অ্যাসিড আছে তা কি তোমরা জানো?

আমাদের শরীরের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বা গঠনমূলক কাজে নানাধরনের অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— বাজারে যে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, সেটার প্রধান উপাদান আমাদের পাকস্থলীতেও খাবার হজম করার সাহায্যের জন্য তৈরি হয়। তার নাম কী বলো তো? — **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।**

তাহলে আমাদের শরীরের পাকস্থলীতেও অ্যাসিড আছে, আবার সেটা কমানোর জন্য যে অম্লনাশক বা অ্যান্টাসিড জাতীয় জিনিসটা খাওয়া হলো, সেটা হলো ক্ষারক।

সব জিনিসের তো স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, সেটা শারীরবিজ্ঞানসম্মতও নয়। তাহলে কীভাবে আমরা অ্যাসিড চিনতে ও বুঝতে পারব? চলো দেখা যাক।

## নির্দেশকের ধারণা

তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের আশপাশ থেকে কয়েকটা লাল জবা ফুল আনো। তারপর জবাফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ও থেঁতো করে একটা ছোটো কাচের গ্লাসে রেখে তার মধ্যে সামান্য ঈষদউষ্ণ জল ঢালো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে যে দ্রবণ উৎপন্ন হবে সেটা কীভাবে আমাদের অ্যাসিড- ক্ষার চিনতে সাহায্য করতে পারে তা দেখা যাক।

তোমরা দুটো আলাদা কাচের গ্লাসে জবাফুলের পাপড়ির রস নিয়ে, একটার মধ্যে কিছুটা ভিনিগার আর অন্যটায় কিছুটা চুনজল যোগ করে তোমাদের পর্যবেক্ষণ লেখো। (অন্য কিছুও নেওয়া যেতে পারে।)

| কী মেশানো হলো | জবা পাপড়ির রসের রং | |
|---|---|---|
| | আগে কী ছিল | পরে কী হলো |
| | | |
| | | |

ভিনিগার হলো অ্যাসিড, সেটা জবাফুলের পাপড়ির রসের রংকে...................... থেকে .................. করল। আবার চুনজল হলো ক্ষারক, সেটা আবার জবাফুলের পাপড়ির রসকে .................... রং থেকে ...................... করল। এখানে জবাফুলের পাপড়ির রসের কাজটা কী হলো? সেটা অ্যাসিড ও ক্ষারক চিনতে সাহায্য করল। তাই এটি নির্দেশক। জবা পাপড়ির রস এখানে নির্দেশক হিসাবে কাজ করে।

চলো একটা নতুন কৌশলে ছবি আঁকার চেষ্টা করি। তোমরা কিছুটা হলুদগুঁড়ো সামান্য জলে মিশিয়ে একটুকরো ফিলটার কাগজে মিশ্রণের প্রলেপ দাও। কাগজটা রোদে শুকিয়ে নাও। একটা কাঠির মাথায় তুলো পাকিয়ে একটা তুলি তৈরি করে খাবার সোডার বা চুনের জলে বা সাবান জলে ডুবিয়ে ওই কাগজটার ওপর একটা মনের মতো ছবি আঁকো তো !

তোমাদের জানা-চেনা এমন কোনো জিনিস আছে কি, যাদের রং অ্যাসিড বা ক্ষারকে পালটে যায়; এরকম কোনো বিষয় জানা থাকলে বলাবলি করে লেখো।

| কী জিনিস | তার নিজের রং | অ্যাসিডে কী রং | ক্ষারকে কী রং |
|---|---|---|---|
| হলুদের জল | | | |
| বিটের রস | | | |
| কালোজামের রস | | | |

তোমার প্রিয় বন্ধুকে একটা গোপন নির্দেশ পাঠাবে? একটু সাহায্য করি! খাবার সোডা কিছুটা জলের মধ্যে মেশাও। আগের মতো একটা তুলি তৈরি করে একটা সাদা কাগজে লিখে ফেলো মনের কথাটা। রোদে শুকিয়ে নিলে কি হবে বলত? — সাদা কাগজ সাদাই থাকবে। যে পড়বে তাকে অবশ্য একটা কথা আগে থেকেই শিখিয়ে রাখো যে একটা বিটের টুকরো কেটে কাগজের লেখার ওপর ঘষে নিয়ে তবে পড়তে হবে!

এছাড়াও অনেক জৈব পদার্থ নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

## অ্যাসিড-ক্ষার বিক্রিয়া

**করে দেখো :** আমরা আগেই দেখেছি যে জবাফুলের পাপড়ির দ্রবণে অ্যাসিড বা ক্ষারক মেশালে তার রং-এর পরিবর্তন হয়। নির্দেশকের এই ধর্মটা কাজে লাগিয়ে নীচের পরীক্ষাটি করে দেখো।

একটা কাচের ছোটো গ্লাসে (বা কাচনলে ) আগের পাতার জবা পাপড়ির পরীক্ষার মতো ভিনিগার দ্রবণ নাও। আর তার মধ্যে আগের তৈরি জবা পাপড়ির কিছুটা দ্রবণ ঢালো। প্রথমে রংটা কেমন হলো? ............................।

এরপর এই মিশ্রণে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে খাবার সোডার দ্রবণ (বা চুন জল) যোগ করতে থাকো। কাচদণ্ড দিয়ে দ্রবণকে ধীরে ধীরে নাড়ো। দ্রবণের মধ্যে যেখানে ফোঁটাটা পড়ছে, সেই জায়গাটা ভালো করে লক্ষ করতে থাকো। ধীরে ধীরে দ্রবণের রং-এর কী পরিবর্তন ঘটছে তা লেখো :
.........................................................................................।

এরকমভাবে খাবার সোডার দ্রবণ (বা চুন জল) যোগ করার ফলে একসময় দ্রবণের গোলাপি রং যে মুহূর্তে সবেমাত্র সবুজ হলো, তখন কী হলো বলে মনে হয়?

— ঠিক তখনই গ্লাসের ভিনিগার দ্রবণের সঙ্গে খাবার সোডার দ্রবণের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে, দ্রবণে ক্ষারক ধর্ম প্রকাশ পেতে শুরু করল।

এরপর ওই সবুজ দ্রবণে আরও কয়েক ফোঁটা খাবার সোডার দ্রবণ মেশাও দ্রবণের রং-এর কী পরিবর্তন হলো? .............................................................................।

এবার কিছুটা ভিনিগার দ্রবণ তার মধ্যে মেশাও। একেবারে প্রথম অবস্থার জবা পাপড়ির দ্রবণ মেশানো দ্রবণের সঙ্গে কোনো মিল পেলে কি? .................................................................।

ওপরের জবা পাপড়ির রং পালটে যাওয়া থেকে কী বোঝা গেল?

ঠিক যে সময় জবাফুলের পাপড়ির দ্রবণ মেশানো ভিনিগার দ্রবণে অন্তত এক ফোঁটা খাবার সোডার দ্রবণ (বা চুন জল) বেশি মেশানো হলো তখনই দ্রবণের রং গোলাপি থেকে সবুজ হলো। তাহলে খাবার সোডার দ্রবণ মেশানোর ফলে ভিনিগার দ্রবণের ধর্ম কি একই থাকল? ................................।

ভিনিগার দ্রবণে যত বেশি খাবার সোডা দ্রবণ মিশতে থাকে, ভিনিগারের সঙ্গে খাবার সোডা বিক্রিয়া করে ভিনিগার দ্রবণের অ্যাসিড ধর্ম তত কমে যায়। যে বিক্রিয়ার ফলে এক্ষেত্রে ভিনিগারের অ্যাসিড ধর্ম আর থাকল না তাকেই আমরা সাধারণভাবে প্রশমন বিক্রিয়া বলি।

- উপরের প্রশমন বিক্রিয়াটি বিটের রস বা কালোজামের রসের সাহায্যে নিজেরা করে দেখো।

**করে দেখো :** কতকগুলো নির্দেশক (যেমন— লিটমাস, ফেনলথ্যালিন বা মিথাইল অরেঞ্জ) নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দ্রবণের রং-এর কেমন পরিবর্তন হয়, সেটা দেখে নীচের সারণিতে লেখো।

| জলীয় দ্রবণ | নীল লিটমাসের রং | লাল লিটমাসের রং | ফেনলথ্যালিনের রং | ........... |
|---|---|---|---|---|
| সাবান/গুঁড়ো ডিটারজেন্ট | | | | |
| জল | | | | |
| লেবুর রস | | | | |

রোজকার জীবনে তোমাদের বাড়ির চারপাশে এমন কোনো প্রশমন বিক্রিয়ার উদাহরণ জানা থাকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো:

| কী কাজে প্রয়োগ হয় | কী মেশানো হয় | কেন মেশানো হয় |
|---|---|---|
| পুকুরের জলে | | |
| মাটিতে | | |

বায়ুতে দূষকরূপে কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের মতো নানা গ্যাস মিশে যায়। অনেকদিন পরে বৃষ্টি হলে ওই গ্যাসগুলো বৃষ্টির জলের মধ্যে মিশে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে। তখন পরীক্ষা করে দেখো তো বৃষ্টির জলের মধ্যে আম্লিক না ক্ষারীয় কোন ধর্ম দেখা যায়।

## অ্যাসিড-ক্ষারের দ্রবণে তাদের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা

নির্দেশক ব্যবহার করে অ্যাসিড বা ক্ষারক কীভাবে চেনা যায় সেটা আমরা দেখেছি। কিন্তু সব অ্যাসিড দ্রবণ কী একই পরিমাণে আম্লিক? তা যে নয়, এসো সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি।

## কর্মপত্র

(a) জীবদেহ বা জৈব উৎস থেকেপাওয়া যায় এরকম তিনটি অ্যাসিডের নাম লেখো—

(1) .................   (2) .......................   (3) ........................

জৈব উৎস থেকে পাওয়া এধরনের অ্যাসিডগুলো তাহলে কী ধরনের অ্যাসিড?

— জৈব অ্যাসিড।

(b) জৈব উৎস নয় এমন উৎস থেকে পাওয়া অ্যাসিডগুলোকে তাহলে কী ধরনের অ্যাসিড বলা যাবে?

.................................. ।

এদের অপর নাম খনিজ অ্যাসিড। এরকম অ্যাসিডের উদাহরণ কী কী হতে পারে?

(1) ............................................।   (2) ....................................।

জলের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যার সংকেত HCl , তা দিলে কী হয়?

জলীয় দ্রবণের মধ্যে অ্যাসিডটা আয়নিত হয়।

$$HCl \rightarrow H^{+} + Cl^{-}$$

অ্যাসিড ভেঙে তৈরি হওয়া হাইড্রোজেন আয়ন ($H^{+}$) জল অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে জলীয় দ্রবণে $H_3O^{+}$ রূপে থাকে, যাকে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন বলে।

$$H^{+} + H_2O \rightarrow H_3O^{+}$$

তাহলে জলীয় দ্রবণে HCl-এর বিয়োজন বিক্রিয়াটি কীভাবে লেখা যাবে?

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^{+} + Cl^{-}$$

(C) জলীয় দ্রবণে HCl ভেঙে গিয়ে কী কী আয়ন উৎপন্ন করছে?

............................, ...................... ।

এখন প্রশ্ন হলো, এদের মধ্যে কোন আয়নটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) বা অন্য কোন অ্যাসিডের অ্যাসিড ধর্মের জন্যে দায়ী?

অন্য কয়েকটা অ্যাসিডের সংকেত ও সেগুলো জলীয় দ্রবণে কীভাবে আয়নিত হয় তা দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয় কিনা দেখো।

| অ্যাসিডের নাম ও সংকেত | জলীয় দ্রবণে কীভাবে ভাঙতে পারে |
|---|---|
| ফরমিক অ্যাসিড (HCOOH) | $HCOO\mathbf{H} \rightarrow HCOO^{-} +$ ............. |
| নাইট্রিক অ্যাসিড ($HNO_3$) | $\mathbf{H}NO_3 \rightarrow$ ................ + ................ |
| সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_4$) | $\mathbf{H}_2SO_4 \rightarrow$ ................. + $SO_4^{2-}$ |

বিভিন্ন অ্যাসিড অণুগুলির ভাঙনের বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখে বলতে পারো কোন আয়ন সব অ্যাসিড ভেঙেই তৈরি হয়?

........................... ;

এটাই তাহলে এই পদার্থগুলোর অ্যাসিড ধর্মের জন্যে দায়ী। যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) (প্রকৃতপক্ষে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন, $H_3O^+$) তৈরি করে তাদের অ্যাসিড বলা হয়।

অ্যাসিড যেমন জলীয় দ্রবণে ভেঙে গিয়ে $H^+$ (প্রকৃতপক্ষে $H_3O^+$) উৎপন্ন করে, চুন বা অন্য কিছু যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়ন ($OH^-$) উৎপন্ন করে। চুনজলের মধ্যে কলিচুনের বিয়োজন বিক্রিয়াটি কীভাবে লেখা যাবে? $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-$

জলীয় দ্রবণে এই সমস্ত যৌগ থেকে উৎপন্ন হাইড্রক্সাইড আয়নই ($OH^-$) অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়নের ($H^+$)সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে। এই যৌগগুলোকেই ক্ষার বলা হয়। অ্যাসিড-ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় জলের সঙ্গে লবণও উৎপন্ন হয়।

অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন ( $H^+$) + ক্ষারের হাইড্রক্সাইড আয়ন ($OH^-$) $\rightarrow$ জল ($H_2O$)

কোনো নির্দেশকেই জল অ্যাসিড বা ক্ষার কোনো ধর্মই দেখায় না। তাই জলকে প্রাথমিকভাবে প্রশম প্রকৃতির দ্রাবক বলা যেতে পারে।

আমরা তাহলে অ্যাসিড-ক্ষারের ধর্মের তুলনা করে লিখতে পারি :

| অ্যাসিডের ধর্ম | ক্ষারের ধর্ম |
|---|---|
| (1) সাধারণভাবে অ্যাসিডের স্বাদ ................। | (1) সাধারণভাবে ক্ষার স্বাদে ................। |
| (2) অ্যাসিড জলে ভেজানো ............ লিটমাসকে ............. করে । | (2) ক্ষার জলে ভেজানো ...........লিটমাসকে ............ করে। |
| (3) অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে $H^+$ উৎপন্ন করে। | (3) ক্ষার জলীয় দ্রবণে ........ উৎপন্ন করে। |

কোন দ্রবণ কতটা আম্লিক বা কতটা ক্ষারীয় তা মাপা হয় pH রাশির সাহায্যে। 0 থেকে 14 পর্যন্ত বিস্তৃত একটি স্কেল এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

pH - এর স্কেলটা কেমন?

প্রশম

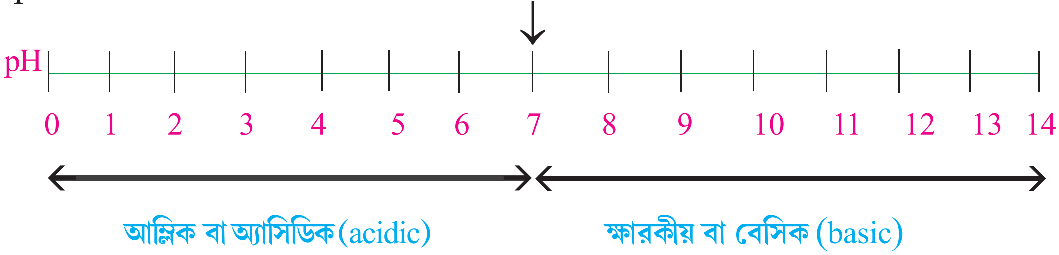


25°C উষ্ণতায় প্রশম দ্রবণের (যেমন-জলের) pH 7 বলা হয়। যে দ্রবণের pH 7-এর থেকে কম (শূন্য পর্যন্ত) সেটি আম্লিক প্রকৃতির। আর যে দ্রবণের pH 7 -এর চেয়ে বেশি (14 পর্যন্ত) সেটি ক্ষারীয়।

**জেনে রাখো :** সহজে pH মাপার জন্য লিটমাস কাগজের মতো pH-কাগজ পাওয়া যায়। pH-কাগজ তৈরিতে একাধিক নির্দেশকের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। একাধিক নির্দেশক থাকে বলেই বিভিন্ন pH-এ কাগজের রং বিভিন্ন হয়। অন্য জটিল পরীক্ষার সাহায্যে ঠিকভাবে pH মাপা সম্ভব। এসম্বন্ধে তোমরা পরে জানতে পারবে।

নীচের দ্রবণগুলোর pH 7, না 7-এর কম, না 7-এর বেশি — কীরকম হতে পারে? pH কাগজের সাহায্যে পরীক্ষা করে লেখো :

| কী দ্রবণ | pH - এর মান 7 এর ওপরে না নীচে | দ্রবণের প্রকৃতি |
|---|---|---|
| ভিনিগারের জলীয় দ্রবণ | | |
| সাবান জল | | |
| খাদ্য লবণের জলীয় দ্রবণ | | |
| খাবার সোডার জলীয় দ্রবণ | | |
| পাতিলেবুর রস | | |

এসো দেখি তোমার পরিচিত আর কোন কোন উপাদানের pH কীরকম।

1. তোমার কাছাকাছি বাজারে যাও। সেখান থেকে তোমার পরিচিত নানা রসালো বা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করো (টম্যাটো, আম, আঙুর, তরমুজ, কমলালেবু, মাছ, মাংস, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি)। এদের pH-এর মান কত হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখো আর আগের সারণির মতো একটা সারণি বানাও। বিভিন্ন খাদ্যের সংস্পর্শে pH পেপারের রং পরিবর্তন থেকে সেই সব খাদ্যের pH-এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো।

2. তোমার পরিবেশে জলের উৎসগুলি চিহ্নিত করো (পুকুর/নদী/বাঁওড়/নয়ানজুলি/খাল/বিল/ট্যাপ ওয়াটার/বৃষ্টির ধরে রাখা জল ইত্যাদি)। এদের জলের প্রকৃতি বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করে জানার চেষ্টা করো। দেখো তো বছরের বিভিন্ন সময় এদের pH-এর মান বাড়ে বা কমে কিনা। বোঝার চেষ্টা করো পরিষ্কার জলে কোন কোন উপাদান মিশলে pH-এর মান হেরফের বা বদল ঘটে।

3. তোমার আশপাশে কি সব ফসলের চাষ ভালো হয়? সব ফসল কি একইধরনের মাটিতে ভালো হয়? তোমার আশপাশের চাষজমি সমীক্ষা করো। (চাষের জমি থেকে মাটির নমুনা নিয়ে জলে গুলে দ্রবণ তৈরি করো। দ্রবণের এক অংশে নির্দেশক যোগ করে দেখো কেমন পরিবর্তন হয়। প্রয়োজনে pH পেপারের সাহায্য নিতে পারো)। দেখো তো সব জমির মাটি একরকম কিনা। প্রয়োজনে লিটমাস কাগজ, pH পেপারের সাহায্য নাও।

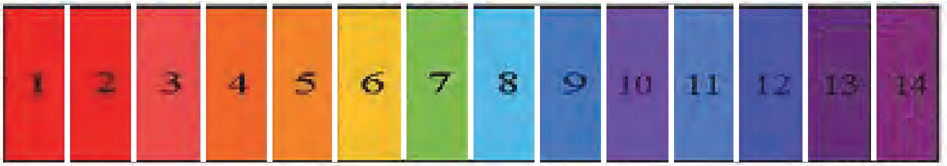


বিভিন্ন pH-এ pH কাগজের রং কেমন হতে পারে তার একটা নমুনা ওপরে দেওয়া হলো।

## মানবদেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য

তোমরা আগেই **অ্যাসিডের** নাম শুনেছ। দেখো তো কতগুলো জিনিস তুমি চিনতে পারো কী না যা অ্যাসিড বা যার মধ্যে কোনো অ্যাসিড মিশে আছে। নীচের তালিকায় আম্লিক জিনিসগুলোর নামের ওপরে ✓ চিহ্ন দাও :

মিউরিয়েটিক অ্যাসিড (বাথরুম পরিষ্কার করার অ্যাসিড), সাবান, লেবুর রস, খাবার জল, দই, ঘোল, ল্যাকটিক অ্যাসিড (যা দিয়ে ছানা কাটানো হয়), ফুচকার জল, বড়ো ব্যাটারির জল।

চিনবে কীভাবে? যেগুলোকে অ্যাসিড বলে জেনেছ, সেগুলো কীভাবে চিনেছ?

..................................।

তাদের মধ্যে কোনো মিল আছে?

..................................।

**মনে রেখো, সব অ্যাসিড মুখে দেওয়া উচিত নয়, দেহের কোনো জায়গায় বা কাপড়ে লাগানো উচিত নয়। অ্যাসিডের প্রভাবে শরীরে ঘা হতে পারে, কাপড় ফুটো হয়ে যেতে পারে।**

তবে আর কি উপায়ে অ্যাসিড চেনা যায়? এসো দেখি?

তোমার লাগবে দু-তিনটে করে লাল লিটমাস কাগজ আর নীল লিটমাস কাগজ, আর যে জিনিসগুলোকে অ্যাসিড বলে চিনতে চাও, তার সামান্য অংশ।

**সহজে জোগাড় করতে পারো :** লেবুর রস, দই, ফুচকার জল, .........

এবার লিটমাস কাগজগুলোকে ছোটো টুকরোয় ছিঁড়ে প্রতিটি দ্রবণে একবার একটুকরো নীল লিটমাস কাগজ আর একবার একটুকরো লাল লিটমাস কাগজ ডোবাও। নীচের ছকে লেখো তো লিটমাস কাগজের রঙের কী পরিবর্তন হলো? [একটা লিটমাস কাগজ মাত্র একবারই ব্যবহার করবে]

| ক্রম | জিনিসটির নাম | নীল লিটমাসের রং কী হলো | লাল লিটমাসের রং কী হলো |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

তাহলে অ্যাসিড চেনার উপায় কী জানলাম লেখো।

......................................................।

মনে রেখো এটা **অ্যাসিডের** একটা ধর্ম।

তোমরা তো ক্ষারের নামও নিশ্চয়ই জানো। দেখো তো নীচের তালিকায় কতগুলো ক্ষারীয় পদার্থকে চিনতে পারো — লেবুর জল, সাবান জল, খাবার জল, চুনের জল, খাবার সোডা মেশানো জল, লস্যি, ফুচকার জল।

ক্ষারগুলোকেই বা কী পরীক্ষা করে চিনবে?

............................ ।

তাদের মধ্যে মিল কোথায়?

............................ ।

অ্যাসিডের মতোই ক্ষারীয় পদার্থও মুখে দেওয়া, গায়ে ফেলা বা কাপড়ে ফেলা অনুচিত।

একে চিনতে গেলেও তোমার লাগবে **লাল** আর **নীল** লিটমাস কাগজ, আর যে যে জিনিস পরীক্ষা করতে চাও তার একটু করে অংশ :

সাবান জল, চুনের জল, সোডার জল ইত্যাদি।

এবার প্রতিটি জিনিসে একবার করে **লাল** লিটমাস কাগজ আর **নীল** লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে তোলো। লিটমাস কাগজের রঙে কী পরিবর্তন হলো, নীচের ছকে লেখো।

| ক্রম | জিনিসের নাম | লাল লিটমাসের রং কী হলো | নীল লিটমাসের রং কী হলো |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

তাহলে **ক্ষারীয়** পদার্থ চেনবার উপায় কী জানলাম?

.................................

মনে রেখো এটা **ক্ষারের** একটা ধর্ম।

মনে রেখো, দেহের কোথাও অ্যাসিড বা ক্ষারীয় পদার্থ লাগলে, বিশেষ করে চোখে বা নাকে গেলে, সেই জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার জল দিয়ে বারবার ধুয়ে ফেলা দরকার। রগড়ে ধোবে না বা সাবান দেবে না। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তুলো দিয়ে আলগা করে ঢেকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। কেউ অ্যাসিড বা ক্ষার খেয়ে ফেললে কোনোরকম দেরি না করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেয়াল চুনকামের সময় কাছে যাবে না। সকলকে সতর্ক করবে যে ক্ষার চোখে পড়লে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

**এবার তাহলে কয়েকটা জিনিস নিজেরা চেনবার চেষ্টা করে দেখো:**

তোমার লাগবে কয়েকটা **লাল** আর **নীল** লিটমাস কাগজ, আর চেনবার জন্য কিছু নমুনা। তারপর প্রতিটি নমুনাকে আগে যেমন করেছো, তেমনভাবে লাল আর নীল লিটমাস কাগজ নিয়ে পরীক্ষা করে নীচের তালিকায় লেখো।

| ক্রম | নমুনা | লাল লিটমাসে কী হলো | নীল লিটমাসে কী হলো |
|---|---|---|---|
| 1 | লেবুর শরবত | | |
| 2 | খাবার জল | | |
| 3 | সাজা পান | | |
| 4 | কাটা কাঁচা আলুর টুকরো | | |
| 5 | কাটা টম্যাটো | | |

কোন নমুনাগুলোকে **অ্যাসিড** বলে চিনতে পারলে?

...............................।

কোন নমুনাগুলোকে **ক্ষারীয়** বলে চিনতে পারলে?

...............................।

এবার বলো তো নীল বা লাল লিটমাসের উপর অ্যাসিড বা ক্ষারক যে ক্রিয়া করে, উপরের নমুনাগুলো মধ্যে কোনগুলি নির্দেশকের রঙের পরিবর্তন দেখায় না?

........................, .....................।

লিটমাসের ওপর তাদের ক্রিয়া কীরকম?

(a) **লাল লিটমাস কাগজে** ................

(b) **নীল লিটমাস কাগজে** ................

এরা হলো প্রশম পদার্থ। এরা জলে দ্রবীভূত হলে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন ($H_3O^+$) দেয়ও না, আবার তাকে প্রশমিতও করে না।

তাহলে এসো অ্যাসিড, ক্ষারক আর প্রশম পদার্থের তুলনা করি :

| বৈশিষ্ট্য | অ্যাসিড | প্রশম পদার্থ | ক্ষারক |
|---|---|---|---|
| নীল লিটমাসের উপর ক্রিয়া | | | |
| লাল লিটমাসের উপর ক্রিয়া | | | |

আমাদের দেহের সব কাজ ঠিকঠাকভাবে চলতে হলে অম্ল-ক্ষারের নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখা দরকার। আমাদের দেহের বিভিন্ন তরলের অম্ল-ক্ষার মাত্রা (pH) বিভিন্নরকম। বলো দেখি কোনটি কেমন?

| তরলের নাম | pH-এর মান | প্রকৃতি (আম্লিক/ক্ষারীয়/প্রশম) |
|---|---|---|
| 1. লালারস | 6.02 — 7.05 | |
| 2. পাকস্থলীর রস | 0.9 — 1.05 | |
| 3. পিত্তরস | 8.0 — 8.60 | |
| 4. রক্ত | 7.35 — 7.45 | |
| 5. মূত্র | 4.0 — 8.0 | |

মানবদেহে একটি নির্দিষ্ট **অ্যাসিড-ক্ষার** ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা দেহের নানা অঙ্গ (দাঁতের এনামেল, অস্থিসন্ধি) ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তাড়াতাড়ি বার্ধক্য চলে আসতে পারে। মানবদেহের প্রত্যেক কোশই ভালোভাবে কাজ করে যখন এটি প্রধানত ক্ষারীয় (pH 7-8) মাধ্যমে থাকে। নানা কারণে রক্ত কখনো-কখনো উল্লেখযোগ্যভাবে আম্লিক হয়। তখন দেহের যেখানে যেখানে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম খুঁজে পায়, সেখান থেকে বৃক্ক রক্তের মাধ্যমে তাকে টেনে নেয়। এই প্রক্রিয়া প্রথমে চুল, ত্বক কিংবা নখ থেকে শুরু হয়। তারপর রক্তে এবং শেষপর্যন্ত হাড়ে পৌঁছোয়।

মানবদেহে **অ্যাসিড-ক্ষার** ভারসাম্য প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

1. নিশ্বাস প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড কতটা বেরোয় তার ওপর।

2. দেহে ঘটে চলা নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিবর্তনের ওপর।

ফুসফুসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে দেহ ক্ষারীয় হয়। আবার ফুসফুস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কম বেরোলে রক্তে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে ($H_2O + CO_2 \leftrightarrows H_2CO_3$)। ফলে দেহতরল আম্লিক হয়ে পড়ে।

এবার নীচের ঘটনাগুলো লক্ষ করো —

1. খেলতে খেলতে হঠাৎ পায়ে চোট পেলে আমাদের খুব ব্যথা হয়। আমরা তখন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যথা কমানোর ওষুধ খাই। এই জাতীয় কিছু ওষুধ অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট করে।

2. কখনো-কখনো আমাদের অনেকেরই মুখ টক হয়। চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

3. আমাদের যখন কোনো অসুখে অনেকবার পাতলা পায়খানা হয়, তখন পায়খানার সঙ্গে অন্ত্রের ক্ষারকীয় রস বেরিয়ে যায়।

4. বিভিন্ন জীবাণু যখন আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে, তখন আমাদের দেহের কোশে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়।

5. আমরা যখন কোনো ভারী কাজ অনেক সময় ধরে করি, তখন আমাদের পেশিকোশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন পেশিকোশে গ্লুকোজ ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন বেড়ে যায়।

6. আমাদের অনেকেরই রক্তে সুগারের (গ্লুকোজ) পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকে। সেক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় যে তাদের দেহকোশে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেছে।

7. মানসিক চাপ বাড়লে বা দীর্ঘদিন ধূমপান করলেও দেহে অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে।

8. আমাদের বৃক্ক যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এবার তোমরা বলো ওপরের কোন কোন অবস্থায় —

দেহে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যায় — .........., .........., .........., .........., .........., .........., ..........।

অম্ল-ক্ষার ও আয়নের ভারসাম্য রক্ষায় দেহের কোন কোন অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বা করে না তা ওপরের আলোচনা থেকে নির্দেশ করো।

যে সব অঙ্গ বা দেহতরল অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে ................, .............., .............।

**টুকরো কথা**

উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া খাদ্যগুলো (ফল, নানা ধরনের শাকসবজি) দেহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষারজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। আবার মাছ, মাংস, ডিমের মতো প্রাণীজ উৎস থেকেপাওয়া খাদ্যগুলো দেহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অম্লজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। মানুষের প্রতিদিনের খাবারের 20 শতাংশ অম্ল উৎপাদনকারী খাদ্য (মাছ, মাংস, ডিম) ও 80 শতাংশ ক্ষার উৎপাদনকারী খাদ্য (ফল, নানা ধরনের শাকসবজি) হওয়া প্রয়োজন। তবেই মানুষের শরীরের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য ঠিক থাকে। যাঁরা আমিষ খাদ্য বেশি খান বা পছন্দ করেন তাদের খাদ্যতালিকায় শরীরের প্রয়োজন মতো 20 শতাংশের মধ্যে এই ধরনের খাদ্য সীমাবন্ধ করা প্রয়োজন।

## খাদ্য লবণ

ওপরের ছবিদুটো দেখে বলো, আমরা খাবার হিসাবে যে সমস্ত জিনিস গ্রহণ করি তাদের প্রধান দুটো উৎস কী কী?

1. ............................... উৎস এবং 2. .............................. উৎস

এই দুটো উৎস থেকে পাওয়া কী কী খাবার তোমরা সাধারণত খেয়ে থাকো তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করো:

| কোন ধরনের উৎস থেকে পাওয়া | কী কী খাদ্য |
|---|---|
| | |
| | |

এই সমস্ত খাবার আমরা কতরকমভাবে খেয়ে থাকি?

1. .......................... 2. ........................ 3. .......................... 4. রান্না করে খাই।

আবার ভেবে দেখো — (ক) সব অঞ্চলের আবহাওয়া একইরকম নয়,

(খ) সব অঞ্চলে সবরকম খাবার পাওয়াও যায় না।

তাই সব অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস কী একইরকম হয়?

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের খাদ্য

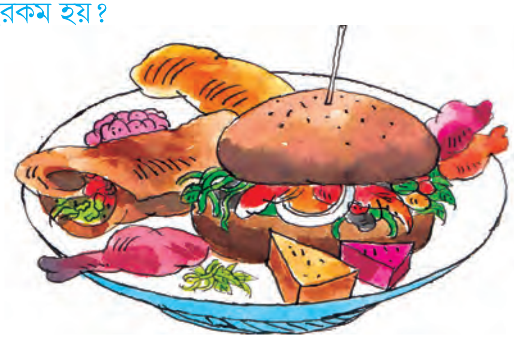

শীতপ্রধান অঞ্চলের খাদ্য